Arjun Beriye Elo by Somoresh Majumdar

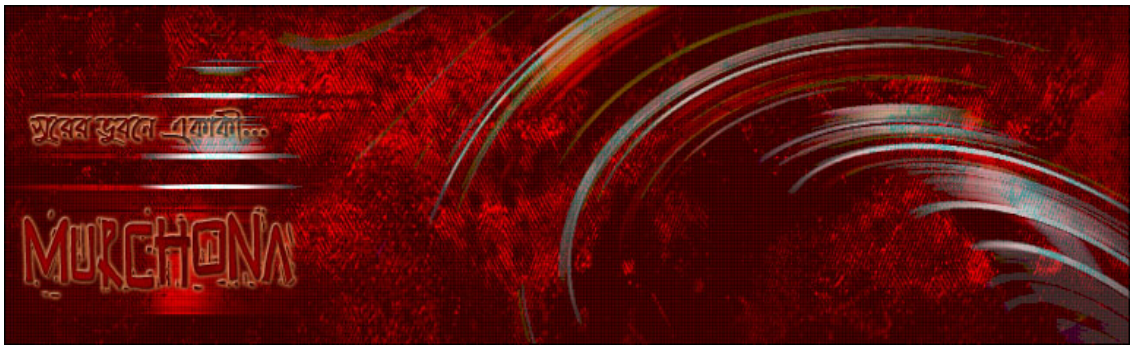

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

অর্জুন বেড়িয়ে এল

সমরেশ মজুমদার

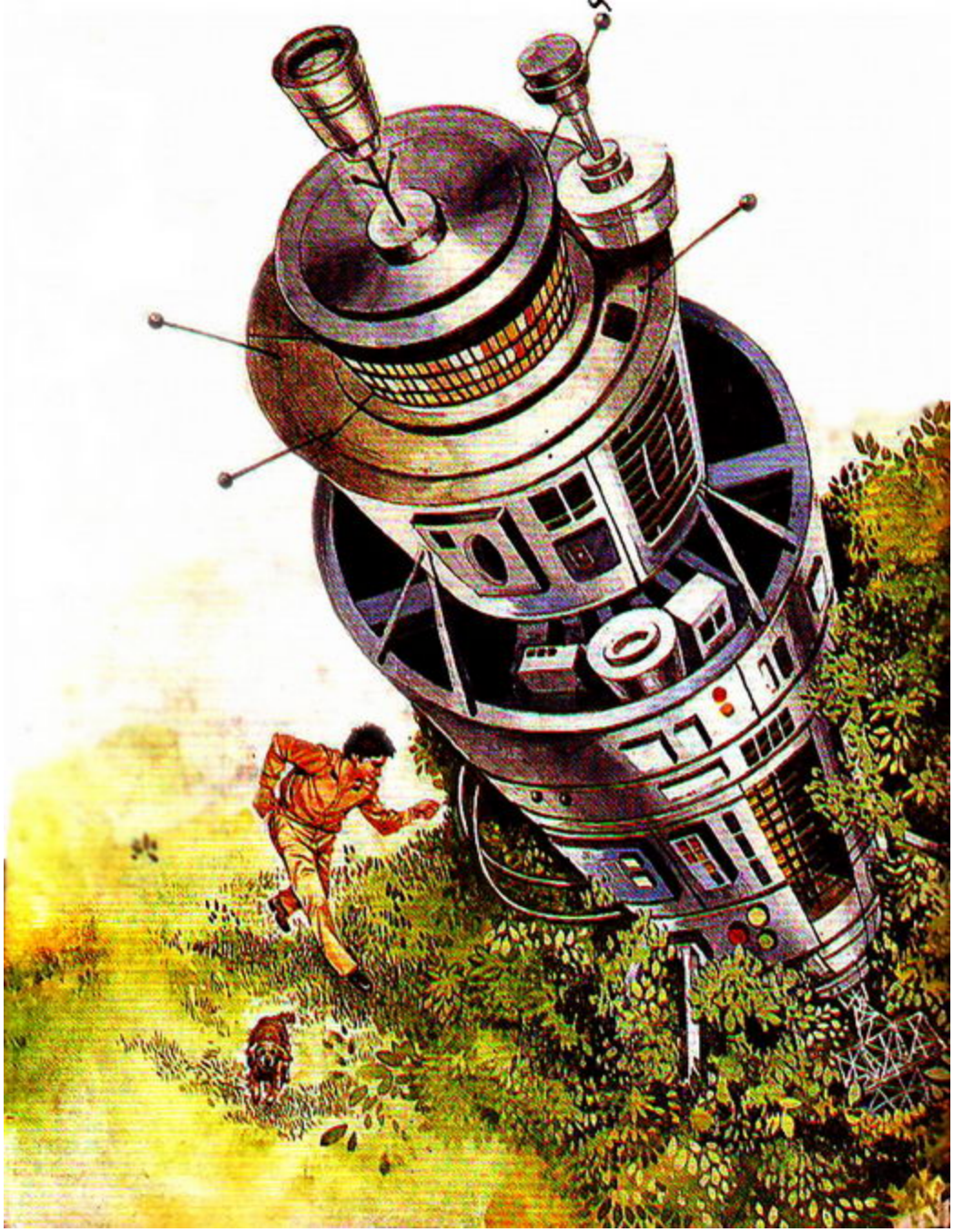

গত চারদিনে তুমুল বৃষ্টি পড়েছে। ঠিক বলা হল না, বৃষ্টিটা তুমুল হচ্ছে রাত্রে, দিনের বেলা টিপটিপিয়ে। আকাশের মুখ হাঁড়িচাচা পাখির চেয়েও কালো। ইতিমধ্যে করলা নদীর পাশের রাস্তাটা ডুবে গিয়েছে। সারা শহর ভিজে।

এই চারদিন বাড়ি থেকে বের হয়নি অর্জুন। স্নান এবং খাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে নামেনি। এখন তার বালিশের পাশে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গোয়েন্দা গল্পের বই। অবশ্য ইংরেজিতে। সেইসঙ্গে একটা 'রিডার ডাইজেস্ট' পত্রিকা থেকে বের করা সঙ্কলন। পৃথিবীর রহস্যময় ঘটনাবলী। এই বইটাই সে পড়ছিল সকালবেলায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে। গোয়েন্দা গল্পের চেয়ে এই বাস্তব রহস্যকাহিনী অনেক বেশি চনমনে।

এই সময় কেউ একজন কড়া নাড়ল। অর্জুন জানে, মা দরজা খুলবেন। একনাগাড়ে চারদিন ছেলেকে বাড়িতে পেয়ে মা খুব খুশি। একটু বাদেই তিনি ঘরে এলেন, "তোর চিঠি।"

হাত বাড়াল অর্জুন। সাদা খাম। মুখ আঁটা। জিজ্ঞেস করল, "কে দিল?"

"একটা ছেলে এসে দিয়ে গেল।" মা বললেন, "আজ খিচুড়ি খাবি?"

"দারুণ। বৃষ্টিটা যা জমেছে না!"

"কাল কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করেও বাজারে যেতে হবে।" মা চলে গেলেন।

খাম খুলল অর্জুন। জগুদার চিঠি। "স্নেহের অর্জুন, আশা করি ভাল আছ। গতরাত্রে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম। আজ ভোরে যখন বেরোচ্ছি তখনও বৃষ্টি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। তুমি আজ বেলা একটা নাগাদ শিলিগুড়িতে আমার অফিসে আসতে পারবে? শিলিগুড়ির সেবক রোডে আমাদের ব্যাঙ্ক। শুভেচ্ছা রইল।তোমাদের জগুদা।"

অর্জুন চিঠিটা দু'বার পড়ল। জগুদার মতো মানুষ অকারণে তাকে শিলিগুড়িতে ডেকে নিয়ে যাবেন না। মিনিবাসেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট লাগে। তার ওপর এই বৃষ্টি। ব্যাপারটা কী? সে জানলা দিয়ে বাইরে

www.Murchona.com
suman_abm@yahoo.com

তাকাল। এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি জল ঝরছে। একটুও ইচ্ছে করছে না বাইরে যেতে। চিঠি খামে পুরে পাশে রেখে সে রহস্যকাহিনীতে মন দেওয়ার চেষ্টা করল। নাঃ, বারেবারে চিঠিটার কথা মনে আসছে। জগুদা খুব সিরিয়াস মানুষ। তাকে বেশ পছন্দ করেন। সে বিছানা থেকে জোরে হাঁক দিল. "মা, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি করো, আমি বেরোব।"

"ওমা, এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবি ?" মায়ের গলা ভেসে এল।

"শিলিগুড়িতে। জগুদা ডেকে পাঠিয়েছেন।"

মায়ের কথাটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। তাই তাঁর গলার স্বর পালটাল।"কখন ফিরবি ?"

"সন্ধের মধ্যেই।" অর্জুন জবাব দিল।

এখন ছাতা হাতে চলা মুশকিল। যা উলটোপালটা হাওয়া বৃষ্টির সঙ্গে বইছে তাতে ছাতি সোজা রাখা যায় না। অর্জুন বর্ষাতি চাপিয়েছিল। মাথায় বারান্দা-দেওয়া টুপি। পায়ে ছোট গামবুট। এই পোশাক পরে দু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় চললেই নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দাকাহিনীর কথা মনে আসে। বিদেশি দু-তিনটে বইতেও এমন চরিত্র সে পড়েছে। গত বছর এখানে অর্জুনের প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন। আলাপ করতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "আচ্ছা, আপনার সন্তু-কাকাবাবুকে ঠিক রহস্যময় গোয়েন্দা মনে হয় না কেন ?" ভদ্রলাক হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন "কীরকম ?"

"এই যেমন ধরুন, একটা বর্ণনা, রাত তখন দুটো, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কেউ নেই। গ্যাসপোস্টের আলোও ঝাপসা। এই সময় লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। পরনে ওভারকোট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, দু' হাত পকেটে ঢুকিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটায় তার চিবুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। পড়লেই কেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়, তাই না ?" অর্জুন বোঝাতে চেষ্টা করছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "ওই লোকগুলোকে আজকাল রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায় না। এই যেমন ধরো তুমি, এত নাম করেছ, তোমাকে দেখে মনে হয় কফি-হাউসে আড্ডা মারতে পারো, খেলার মাঠেও চিৎকার করতে পারো। এটাই তো ভাল।"

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল তার প্রিয় লেখক এখন তাকে দেখলে কী বলতেন ? সে হেসে ফেলল। কদমতলা পৌঁছে সে আবিষ্কার করল বাস নেই রিকশাও বের হয়নি শহরে। পথেঘাটে মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। রূপমায়া সিনেমার পাশে একটা মিষ্টির দোকানের শেড-এর তলায় দাঁড়াতেই শুনল ভেতরে বসা কয়েকজন বলছে ডুয়ার্সের নদীর জল বেশ বেড়ে গিয়েছে। এমনকী কার্নিশের ওপরের দিকে জল ঢুকে

পড়েছে। এসব শুনে সে বুঝতে পারছিল না কী করবে এই সময় একটা মিনিবাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল। কণ্ডাক্টর চিৎকার করছে "শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি " অর্জুন মিনিবাসে উঠে দেখল দু'জন যাত্রী বসে আছেন পুরো গাড়িতে। টুপি আর কোট খুলে সে সিটে বসল। জলে জলময় হয়ে যাচ্ছে বাসের ভেতরটা।

জলপাইগুড়ির মোড় ছাড়িয়ে বাসটা যখন শিলিগুড়ির পথে, তখনও অর্ধেক সিট খালি। বৃষ্টির জন্যই খুব দ্রুত যেতে পারছে না গাড়িটা। যাওয়ার পথে যে-ক'টা ছোট নদী পড়ল সেগুলো টইটম্বুর। শিলিগুড়ির থানার সামনে বাস থেমে গেলে নেমে পড়তে হল। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে সকাল থেকেই বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশের অবস্থা যা, তাতে যে-কোনও মুহূর্তেই প্রলয় হয়ে যেতে পারে। অর্জুন একটা রিকশা নিল। টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।

ঠিক একটা বাজতে দশে সে জগুদার ব্যাঙ্কে পৌঁছলো। জগুদার ভাল নাম অশোক গাঙ্গুলি। জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল ঘরটা। ঘরে ঢুকতেই জগুদা হাসলেন, "যাক, এসেছ তা হলে। বোসো, বোসো। চা খাবে ?"

"খেতে পারি।" অর্জুন তার ওভারকোট আর টুপিটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে দিল। বেশ শুকিয়েএসেছে এরমধ্যে। জগুদা চায়ের হুকুম দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে দেখছি বৃষ্টি নেই।"

"ফোরকাস্ট বলছে বিকেলে ভাসাবে। খেয়ে এসেছ ?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না কেন জগুদা তাকে ডেকেছেন। এতক্ষণ যেসব কথা হল তাতে জরুরি কোনও প্রয়োজন আছে। সে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলে ঠিক করল। ব্যাঙ্কে জগুদার ওপরে কাজের চাপ আছে। একের পর এক লোক আসছে খাতাপত্র নিয়ে। তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে সমস্যাগুলো। জগুদা তার মধ্যে বললেন, "আর মিনিট পাঁচেক।"

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই জগুদা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন, "আসুন, আসুন। কেমন আছেন ?"

"আর থাকা। এখনও বেঁচে আছি। বিদেশের হাজারো লোভ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলাম মন দিয়ে কাজকর্ম করব বলে, তা আর হচ্ছে কই ? বসছি !" ভদ্রলোক অর্জুনের পাশের চেয়ারটা নিজেই টেনে নিলেন।

"নিশ্চয়ই।"

তিনজনে বসামাত্র তিনকাপ চা এল। ভদ্রলোক বললেন, "আমি তো চা খাই না। আপনারা খান। আমার চেকগুলোর কোনও খবর আছে ?"

"আমি খুব দুঃখিত ডক্টর গুপ্ত। একটু আগেও আমি খোঁজ নিয়েছি। আসলে বিদেশি ব্যাঙ্কের চেক বলেই দেরি হচ্ছে। আমি হেড অফিসে ফোন করেছিলাম। ওরাও চেষ্টা করছে।" জগুদা বললেন।

"ঠিক আছে। আমার যা আছে তাতে দিন পনেরো চলে যাবে।"

এই সময় একজন খাতা নিয়ে জগুদার কাছে আসতেই তিনি 'এক মিনিট' বলে তাতে ঝুঁকে পড়লেন। অর্জুন ডাক্তার গুপ্তকে দেখছিল। আশিভাগ চুলই সাদা ছোট্ট পাকা আমের মতো শরীর। চোখে পুরু চশমা। ডাক্তার হিসাবে নিশ্চয়ই ইনি খুব ভাল, নইলে জগুদা এত খাতির করতেন না।

কাজ শেষ করে জগুদা মুখ ফেরালেন, "ডক্টর গুপ্ত, আপনি কি স্থির করলেন ? পুলিশের কাছে যাবেন না ?"

"কোনও লাভ হবে না মিস্টার গাঙ্গুলি। পুলিশকে বললে তারা আমার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে পারে। কিন্তু ক'দিন ? তা ছাড়া হাজারটা কৈফিয়ত। এসব আমার ভাল লাগে না। খবরের কাগজ জানতে পারবেই। আপনাকে আমি বলেছি যে, প্রচার চাই না। আর ক'টা দিন যদি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি তা হলে আমি নিজেই প্রেসকে বলব।" ডক্টর গুপ্তের ডান হাত বারংবার নিজের মাথার চুলে চলে যাচ্ছিল। বোধ হয় কথা বলার সময় চুলে হাত বোলানো তাঁর বদ-অভ্যাস।

এবার জগুদা বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে ওকে জলপাইগুড়ি থেকে আসতে বলেছিলাম। খুব খারাপ আবহাওয়া সত্ত্বেও চলে এসেছে।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, "আচ্ছা ! এরই কথা সেদিন বলেছিলেন ?"

"হ্যাঁ। দেখতে অল্পবয়সী হলে কী হবে এর মধ্যে দারুণ-দারুণ সমস্যার সমাধান করে বসে আছে। এমনকী ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় গিয়েও অপরাধী ধরেছে।"

"তাই নাকি ? বাঃ। দেখে তো মনেই হয় না। কি নাম ভাই ?"

"অর্জুন।"

কী একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, "বাঃ। চমৎকার নাম। কিন্তু মহাভারতটা কি ভাল করে পড়া আছে ? অর্জুন চরিত্রটা কি জানা ?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, সে জানে।

"বেশ। এবার আমায় একটা সমস্যার সমাধান করে দাও তো। মহাভারতের অর্জুন একসময় স্বর্গে গিয়েছিলেন। যেখানে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বেশ কিছুদিন ছিলেনও সেখানে। তারপর ফিরে এসেছিলেন। তা স্বর্গ মানে আউটার স্পেস। পৃথিবীর বাইরে। সেখানে

কারও বয়স বাড়ে না। এমনকী উর্বশীরও বাড়েনি। অতএব অর্জুন যখন সেখানে কিছুদিন ছিলেন তাঁরও তো বয়স বাড়ার কথা নয়। তা তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দাদা, ভাই, স্ত্রীর বয়স পৃথিবীতে থাকার দরুন বেশ বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন তো বয়সে সবার ছোট হয়ে গেলেন, তাই না ?"

অর্জুনের বেশ মজা লাগল। মহাভারতে এই ঘটনার কথা সে পড়েছে। কিন্তু এটা যে সমস্যা হতে পারে তা সে ভাবেনি কখনও। কাউকেও বলতেও শোনেনি। ডক্টর গুপ্ত তার উত্তরের অপেক্ষা করে আছেন দেখে সে বলল, "পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করবে অঙ্কের ওপর।"

"অঙ্ক ? ইন্টারেস্টিং ! কীরকম ?"

"প্রথমত, অর্জুন কতদিন স্বর্গে ছিলেন ? স্বর্গের একদিন মানে পৃথিবীর কতদিন ? এখানে সূর্যের উদয়-অস্তের সঙ্গে দিনের পরিমাপ করা হয়। স্বর্গে নিশ্চয়ই তা হয় না। তা হলে স্বর্গের দিন মাপার পদ্ধতিটা কি ? সেটা বের করে স্বর্গের একটা দিনের সমান পৃথিবীর কতদিন হয় বের করে যে-ক'দিন অর্জুন সেখানে ছিলেন সেই ক'টা দিন দিয়ে গুণ করলেই পৃথিবীর সময়টা বেরিয়ে আসবে। যদি তিন-চার মাস হয় তা হলে ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না।" অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল বলতে।

"চমৎকার। কিন্তু স্বর্গের সময়টা কীভাবে মাপবে ?"

"সেটা মহাভারতে নেই। পৃথিবী থেকে স্বর্গে হেঁটে যেতে কত সময় লাগে তা মহাপ্রস্থানের সময় হিসাব করে জানা যেতে পারে।"

"তাতে কী লাভ ? পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী যদি রথে চেপে যেতেন তা হলে নন-স্টপ পৌঁছে যেতেন। হুম। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। তুমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ?"

"হ্যাঁ। তাই বলতে পারেন।"

এবার ডক্টর গুপ্ত জগুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি একে কিছু বলেছেন ?"

"না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তা ছাড়া আপনিও আমাকে সব খুলে বলেননি।" জগুদা হাসলেন, "অর্জুন, ডক্টর গুপ্ত অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। প্রায়ই বিদেশের সায়েন্স জার্নালে ওঁর লেখা বের হয়। আমার সঙ্গে আলাপ সেই বাবদ পাওয়া চেক ভাঙানোর সুবাদে। অবশ্য উনি এখন আমাকে বেশ স্নেহ করে ফেলেছেন। উনি একটা সমস্যায় পড়ায় আমার মনে হয় তোমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুনলেই তো উনি পুলিশের কাছে যাবেন না।" জগুদা বিস্তারিত বললেন।

"সমস্যাটা কী ?" অর্জুন জানতে চাইল।

"সেটা বুঝতে গেলে তোমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে।"

"মুখে বলা যায় না?"

"বললেও স্পষ্ট হবে না। অন্তত সত্তরভাগ সমস্যা মানুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করে না। তিরিশভাগ শুনে বা পড়ে অনুভব করা যায়।" ডক্টর গুপ্ত হাসলেন, "আমার আস্তানা এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে একটা পুরনো অস্টিন গাড়ি আছে। পাহাড়ি পথ, তাই যেতে মিনিট চল্লিশেক লাগবে।" কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর গুপ্ত, "চলি মিস্টার গাঙ্গুলি।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, "কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে গেলে কি আজ জলপাইগুড়িতে ফিরতে পারব ? এমনিতেই বাস খুব কম।"

জগুদা বললেন, "যদি না পারো তা হলে আমি মাসিমাকে নিজে গিয়ে বলে আসব কোনও চিন্তা না করতে। তুমি কিছু ভেবো না।"

অগত্যা অর্জুন ডক্টর গুপ্তকে অনুসরণ করল। মানুষটিকে তার ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়েছে। মনের ভেতরে একটা খুঁতখুতানি ছিল মায়ের জন্য। তবে এখন তো সবে পৌনে দুটো। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে ফেরার বাস সন্ধে সাতটাতেও পাওয়া যায়। শুধু এখানে বৃষ্টিটা না নামলে হয়।

ডব্লু বি এ নাম্বার দেওয়া একটা কালো গাড়ি ব্যাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-ধরনের প্রাচীন গাড়ি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এ-গাড়ি খুব বিশ্বস্ত। আমাকে কখনও বিপদে ফেলে না। চলার সময় একটু প্রতিবাদ করে, এই যা।"

গাড়িতে উঠে অর্জুন দেখল বাইরে থেকে যতটা মনে হচ্ছিল ভেতরটা কিন্তু ততটা পুরনো নয়। অথচ এই গাড়ির বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হয়ে গিয়েছে। ডক্টর গুপ্ত এঞ্জিন চালু করে চলতে আরম্ভ করতেই রাস্তার লোকজন তাকাতে আরম্ভ করল। এত নামী একজন বৈজ্ঞানিক এমন গাড়ি ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও অশোভন হবে বলে সে চুপ করে গেল।

গাড়ি এখন সেবক ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। শিলিগুড়ি পার হওয়ার পর দু'দিকে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় অর্জুনের মনে হল যে-কোনও মুহূর্তে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যাবে। এত কালো আকাশ এমন নীচে সে কখনও দেখেনি। এই রাস্তায় অর্জুন বেশ কয়েকবার গিয়েছে এর আগে। ডান দিকে বাগরাকোটে আর ওদিকে তিস্তাবাজারের কাছে বেশ কিছু বসতি আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথায় থাকেন ?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কালীঝোরা বাংলোটা পেরিয়ে খানিক ওপরে। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাংলো ছিল ওটা। আমি নিজের মতো করে নিয়েছি।"

www.boiRboi.com

"জগুদা মানে মিস্টার গাঙ্গুলি আপনার সমস্যার কথা বলছিলেন !"

"হ্যাঁ ভাই। বছরখানেক আছি আমি এখানে। গত বছর আমার এক বন্ধু আমেরিকা থেকে এসেছিল নেহাত গায়ে পড়েই। এখানে আসার পর কাউকে আমি আসতে বলিনি। লোকটার নাম রবার্ট সিনক্লেয়ার। একটা সায়েন্স জার্নালের সম্পাদক। লেখা পাঠাই, ছাপলে চেক পাঠায়, তাই ঠিকানা ওর জানা ছিল। তা বলা-কওয়া নেই চলে এল দুম করে। আমি কী নিয়ে গবেষণা করছি তা জানার জন্য খুব কৌতূহল ওর। তিনদিন ছিল, আমি জানাতে চাইনি। কারণ জানতে পারলেই গবেষণা শেষ হওয়ার আগেই ও ওর জার্নালে ছেপে দেবে। কিন্তু মুশকিল করল তাতান।"

"তাতান কে ?" অর্জুন জানতে চাইল।

"আমার কুকুর। ওকে দেখে বব, মানে রবার্টের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।"

"কেন ? অদ্ভুত ধরনের কুকুর বুঝি ?"

"একটু অদ্ভুত। লম্বায় দুই ইঞ্চি, প্রস্থে ইঞ্চিতিনেক।"

অর্জুনের মনে হল সে নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। ওটা ইঞ্চি না হয়ে ফুট হবে।

ডক্টর গুপ্ত হাসলেন, "কী, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ববেরও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যখন বুঝল ওটা ইঁদুর নয়, সত্যিকারের কুকুর, তখন নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ঝুলোঝুলি। দশ হাজার ডলার দাম দিয়েছিল সে তাতানের। তার মানে আমাদের দেশের দু' লক্ষ টাকা। আমি দিইনি। এমনকী তাতানের ফোটো তুলতেও অনুমতি দিইনি। ব্যাটা করল কি, দেশে ফিরে গিয়ে এ-সবই তার জার্নালে ছেপে দিল। আর তারপর থেকেই সমস্যা শুরু হয়ে গেল।"

"কীরকম ?" অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে আষাঢ়ে গল্প শুনছে।

"লোক আসতে লাগল একের পর এক। সবাই তাতানকে দেখতে চায়, কিনতে চায়। প্রথম দিকে বুঝিনি, দেখিয়েছি। দু'-দু'বার চুরির চেষ্টা হল। শেষপর্যন্ত বাড়ির চারধারে ইলেকট্রিক তার লাগালাম। দুটো লোক শক খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদিকে এখন দাম উঠেছে দশ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। একাই সামলে নিচ্ছিলাম। তাতানকে আর বাইরে বের করি না। কিন্তু এখন ঘটনা ঘটছে আরও খারাপ।"

"কী ঘটনা ?"

"সেটা মুখে বললে তুমি বুঝবে না। চলো, গিয়ে দেখবে।"

সেবক ব্রিজের গা ঘেঁষে গাড়ি উঠছিল ধীরে-ধীরে। জায়গাটা এর মধ্যেই অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। নীচ থেকে তিস্তার আওয়াজ উঠে আসছে। নিশ্চয়ই জল আরও বেড়েছে। কালীঝোরা বাংলো দেখা গেল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত প্রশান্তমুখে গাড়ি চালাচ্ছেন। ভদ্রলোকের

কুকুরের নাম তাতান। তার উচ্চতা দুই ইঞ্চি। ভাবা যায়? হঠাৎ ডক্টর গুপ্ত বললেন, "ওই যে শ্রীমানরা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মহা মুশকিল।"

নির্জন পাহাড়ি রাস্তার একধারে একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়ে। তার সামনে একজন সাহেব আর দু'জন ভারতীয় হাত তুলে তাদের থামতে বলছে। ডক্টর গুপ্ত বাঁ হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার বের করে ডান হাতে নিয়ে মারুতি গাড়ির টায়ার লক্ষ করে ট্রিগার টিপলেন চলন্ত অবস্থায়। লোকগুলো হকচকিয়ে গেল। তার মধ্যেই তিনি পেরিয়ে এলেন জায়গাটা। রিভলভার রেখে দিয়ে বললেন, "এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। থামলে ওরা ঝামেলা করত, না থামলে ওভারটেক করে এসে গাড়ি আটকাত। ওরা চাকা বদলাতে-বদলাতে আমি বাংলোয় ঢুকে যেতে পারব।"

"এরা কী চাইছে?"

"আমাকে ব্যবহার করতে।" ডক্টর গুপ্ত চুপ করে গেলেন।

শেষপর্যন্ত পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁ দিকের কাঁচা পথ ধরল। একটু চড়াই উঠতে অর্জুন বেদম হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাকে তুলে নিয়ে আসতে পারলেন ডক্টর গুপ্ত। লম্বা-লম্বা গাছের পর বাংলোটা দেখা গেল। এককালে সাদা রং ছিল এখনও বোঝা যায়। বাংলোর চারপাশে খালি জমি, তারপর লোহার বিম দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে। পনেরো ফুট উচ্চতার বেড়ার ওপরে অন্তত ফুটচারেক তারের সারি চলে গেছে। অর্জুন বুঝল ওখান দিয়েই বিদ্যুৎ যাচ্ছে। মাঝখানে একটা গেট আছে। ভেতর থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে আসছে, যদিও এই বাংলোয় সরকারি বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। ডক্টর গুপ্ত পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলার বের করে কয়েকটা নম্বর টিপতেই গেট খুলে গেল। অর্জুন বুঝতে পারল গেট খোলার জন্য সাঙ্কেতিক নম্বর আছে যা জানা না থাকলে ওটা খুলবে না। ভেতরে ঢুকে আবার নম্বর টিপে গেট বন্ধ করলেন তিনি। গাড়িটাকে সোজা নিয়ে এলেন বাংলোর গাড়ি বারান্দার নীচে। রিভলভারটা পকেটে ফেলে বললেন, "এই আমার আস্তানা। দাঁড়াও দরজা খুলি।"

দরজায় কোনও তালা নেই। কিন্তু রিমোট টিপে ধরতেই সেটা খুলে গেল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "পেছনের সিটে সারা সপ্তাহের বাজার আছে, তুমি যদি একটু হাত লাগাও তা হলে তাড়াতাড়ি হয়।"

বড়-বড় প্যাকেট ভর্তি সবজি, মাংস ইত্যাদি জিনিস। অর্জুন সাহায্য করল। আর এই সময় হাওয়া ছাড়তেই শীত-শীত করে উঠল অর্জুনের। টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল। গাড়ি বন্ধ করে মালপত্র নিয়ে ডক্টর গুপ্ত ভেতরে ঢুকে বললেন, "নীচতলাটা বসা আর থাকার ঘর। কিচেন টয়লেটও এখানে। ওপরটা আমার কাজের জন্য। ওখানে আমি ছাড়া

কারও যাওয়া নিষেধ। নিচটাকে নিজের মতো মনে করো।"

॥ ২ ॥

বসার ঘরটি সুন্দর। বাহুল্য কিছু নেই। দুটো বেডরুম আছে। ডক্টর গুপ্ত মালপত্র কিচেনে রেখে গরম জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। বৃষ্টি নেমেছে। পাহাড়ি গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে খ্যাপা বাতাস। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "সরকারি কারেন্ট যখন আছে তখন জেনারেটারটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। অবশ্য ওটি খুব শক্তিশালী। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চলতে পারে।" চোখের আড়ালে চলে গেলেন ভদ্রলোক। তারপরেই শব্দটা থেমে গেল। অর্জুন কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। এরকম অবস্থা যদি বিকেল পর্যন্ত চলে তা হলে আজ ফেরার কথা ভুলে যেতে হবে। এমনিতেই ঘরে আলো জ্বলছে এখন।

সে বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসল। ব্যাঙ্কে ডক্টর গুপ্ত টাকার কথা বলছিলেন। কিন্তু এই বাড়ির পেছনে যাঁর এত খরচ হয় তাঁকে কি গরিব বলা যায়? কখনও নয়। এত খরচ করে নিরাপদে থেকে উনি কী করছেন? একা থাকতে হাঁফিয়ে ওঠেন না? এই সময় ডক্টর গুপ্ত একটা জুতোর বাক্স নিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। বললেন, "এবার কফিটা বানিয়ে ফেলি, তুমি ততক্ষণ তাতানের সঙ্গে ভাব করো।" জুতোর বাক্সটা অর্জুনের সামনের টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন।

অর্জুন দেখল বাক্সটা একটু অন্যরকমের। গোল-গোল সিকি সাইজের গর্ত আছে ওপরে। একপাশে হুক লাগানো আছে, মানে সেটি দরজা। হুক ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। তারপর অর্জুনের অবাক হওয়া চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তাতান। ডক্টর গুপ্ত যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি। তাতানের গায়ের রং খয়েরি। কান ঝোলা। বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের পা মুড়ে বসে সে অর্জুনকে দেখতে লাগল। তার লেজ নড়ছে। পৃথিবীর কোথাও কেউ এত ছোট কুকুরের কথা শুনেছে? অর্জুন ডাকল, "তাতান?"

তাতান উঠে দাঁড়াল, তারপর মুখ তুলে ডাকল। খুব মিহি ডাক। অন্যমনস্ক থাকলে এমন ডাক কানেও ঢুকবে না। অর্জুন আঙুল বাড়াতেই চারপায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল তাতান। তারপর ঘুরে একদৌড়ে বাক্সের ভেতর।

এই সময় একটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর গুপ্ত, "কী, ভাব হল তাতানের সঙ্গে? কোথায় গেল?"

ট্রে নামিয়ে কফি দিয়ে তিনি চেয়ার টেনে বসে ডাকলেন, "তা-তান।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে ছুটে এল কুকুরটা। টেবিলের ওপর হাত

পেতে দিতেই সে উঠে পড়ল সেখানে। হাত না ভাঁজ করে ডক্টর গুপ্ত তাকে নিয়ে এলেন নিজের মুখের সামনে, "আই অ্যাম সরি তাতান। তোর এই দশা আমার জন্যই হয়েছে। কিন্তু আমি যে এখনও অভিমন্যু। ঢুকতে জানি, বেরোতে জানি না।" বিস্কুটের কুচি ভেঙে তাতানকে খাওয়ালেন তিনি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কি অন্য কুকুরদের মতোই খায় ?"

"হ্যাঁ, সব খায় তাতান। খুব ভাল।" তিনি কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেন টেবিলের ওপরে। অর্জুনের মনে হল একটা পুতুল-কুকুর হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই পুতুলের দাম এখন দশ লক্ষ টাকা উঠেছে ? সে জিজ্ঞেস করল, "তাতানকে আপনি কি করে পেলেন ?"

"তিস্তাবাজারে এক বুড়ো নেপালি কয়েকটা পাহাড়ি কুকুরের বাচ্চা বিক্রি করছিল। কালিম্পং থেকে ফেরার পথে দেখতে পেয়ে কিনে এনেছিলাম। তখন ওর বয়স হবে মাসদুয়েক। নাম রাখলাম তাতান। বছর দেড়েকের মধ্যে বেশ তাগড়াই হয়ে গেল। পাহাড়ি কুকুর বেশি লম্বা হয় না। তাতান ফুট দেড়েক হয়েছিল। ভারী সুন্দর গায়ের লোম। ওই যে দেওয়ালে ছবি দেখছ, ওই হল তাতান।"

অর্জুন দেওয়ালের ফটোটা দেখল। স্বভাবিক চেহারার একটা কুকুরের ছবি। অবিকল এই তাতানের মতো দেখতে, কিন্তু বহুগুণ বড়। সে প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "অতবড় কুকুর এত ছোট হল কী করে ?"

"আমার ভুলে।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

ডক্টর গুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আমার সমস্যাটা তো এখানেই। বব ওর জার্নালে ছাপিয়েছে, আমি এমন কিছু আবিষ্কার করেছি যে, বড় জিনিস ছোট করতে পারি। এবার ধরো, একটা জায়গায় বিরাট বস্তি আছে। জমির মালিক কাউকে উচ্ছেদ করতে পারছে না, কিন্তু সেটাই তার বাসনা। লোকটা আমাকে বলল আমি যদি পুরো বস্তিটাকে দুই ইঞ্চি করে দিই তা হলে সে আমাকে অনেক টাকা দেবে। জমির মালিক বেলচায় তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। এক ইঞ্চি সাইজের মানুষগুলো প্রতিবাদও করতে পারবে না। আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না এটা আমার গবেষণার বিষয় নয়। তাতানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে গিয়েছে।"

"কী করে হল ?"

"সেটাও আমি বুঝতে পারিনি এখনও। তবে অনুমান করতে পারি। তার আগে বল পৃথিবীতে আমাদের বয়স কিভাবে বাড়ে ?"

"মিনিট ঘণ্টা দিন সপ্তাহ মাস বছর হিসাব করে।"

"গুড। পৃথিবী যে সময়টায় সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে তা মোটামুটি

তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে। আমরা বলি এক বছর। কিন্তু আমাদের এক বছর আর চাঁদে বাস করলে যে এক বছর হবে তা এক নয়। একই সময়ে সেখানে বয়স বেশি বাড়ে। অর্থাৎ তুমি যদি চাঁদে গিয়ে থাকো তা হলে দশ বছর পরে তোমার সমান বয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে একটুও মিল থাকবে না। তেমনই সাতশো দিনে সূর্যকে যে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, সেখানে বাস করলে পৃথিবীর থেকে কম বয়স বাড়ে। এটা অঙ্ক। আমি আবিষ্কার করতে চলেছি এমন একটি গ্রহের, যেখানে বাস করলে বয়স আদৌ বাড়বে না। সেটা করতে গিয়ে তাতানকে আমি এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে স্থির হয়ে যাওয়ার পরের স্টেজ, অর্থাৎ বয়স কমতে থাকে।"

অর্জুনের মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "বয়স কমলে আকৃতি ছোট হয়ে যাবে কেন?"

"বয়স বাড়লে একটা সময় পর্যন্ত আকৃতি বাড়ে?"

"হ্যাঁ, তা বাড়ে।" অর্জুন স্বীকার করল।

"তাতান যতটুকু বেড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি বাড়ত স্বাভাবিক অবস্থায়। সেই ততটুকু কমে যেতে ওর এই অবস্থা হয়েছে।" ডক্টর গুপ্ত বললেন।

ঠিক এই সময় ওপরের ঘর থেকে একটা কুঁ- কুঁ শব্দ ভেসে এল। অর্জুন দেখল শব্দটা শোনামাত্র তাতান লাফাতে লাগল। ভয় হচ্ছিল, তাল সামলাতে না পেরে বেচারি টেবিল থেকে হয়তো পড়ে যাবে। ডক্টর গুপ্ত টেবিলের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে বললেন, "নো, ঘরে ঢুকে যাও তাতান। অত উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ওই পুঁচকে কুকুর যেন পাগল হয়ে উঠছিল। অনর্গল তার খুদে গলায় ডেকে যাচ্ছিল সে। ডক্টর গুপ্ত এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, "কুকুরটাকে একটু নজরে রেখো, আমি আসছি।"

উনি ওপরে চলে যেতে অর্জুন নিজের কড়ে আঙুলটাকে তাতানের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তাতান ছুটে এল সেটাকে কামড়াতে। আঙুল সরিয়ে নিল অর্জুন চট করে। কুকুর কামড়ালে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হয়। তা সাধারণ মাপের কুকুর হোক আর এই পুঁচকে কুকুরই হোক। দুটোই তো কুকুর। হঠাৎ কুঁ-কুঁ শব্দটা থেমে গেল। তাতান কান খাড়া করে ওপরের দিকে তাকাল। যেন খুব হতাশ হয়েছে সে। একটু পরে শান্ত হয়ে বসল নিজের ঘরের সামনে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত নেমে আসছেন। এসে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর জন্য আমাকে কাজকর্ম ছাড়তে হবে দেখছি। এ তো বড় জ্বালা হল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিন্তু এখনও আপনার সমস্যা

বলেননি ?"

"উৎপাত। আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না।"

"কী করে সম্ভব সেটা ? আমি যা দেখলাম বিনা অনুমতিতে এই বাংলোয় কোনও মানুষ ঢুকতে পারবে না। উৎপাত করবে কীভাবে ? হ্যাঁ, আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন সমস্যায় পড়তে পারেন। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তো বন্দুক রেখেছেন।"

"তোমার কি মনে হচ্ছে এখানে আমি খুব নিরাপদে আছি ?"

"নিশ্চয়ই। কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন।"

হাসলেন ডক্টর গুপ্ত, "তুমি বাইরের দেওয়াল আর তার ওপরের ইলেকট্রিক তার দেখেছ। কিন্তু মাথার ওপরে তো খোলা আকাশ রয়েছে হে। উৎপাত হচ্ছে সেখান দিয়েই। রিভলবার ছুঁড়ব তারও তো কোনও উপায় নেই।"

অর্জুন চিন্তিত হল। মাথার ওপর আকাশ দিয়ে কেউ আসছে নাকি ? আশেপাশের গাছ থেকে লাফিয়ে নামছে ? যদি নামেও, তা হলে ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই। সে উঠে জানলার কাছে গেল। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব হবে না। সে গাছগুলোকে দেখল। না, দেওয়াল থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা। কোনও মানুষের পক্ষে ওই গাছে উঠে এদিকে লাফিয়ে পড়া সম্ভব নয়। তা হলে ? জানলার কাচের এপাশে দাঁড়িয়ে সে ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ডিকিটা খুলে গেল ধীরে-ধীরে। তারপর বাড়তি টায়ার যা ডিকিতে থাকে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অর্জুন। সে দেখল টায়ারটা বৃষ্টির মধ্যে সামনের লনে পাক খাচ্ছে। ঠিক যেভাবে বাচ্চা ছেলেরা চাকা নিয়ে দৌড়য় সেইভাবে পাক খেয়ে চলেছে। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওদিন ভূত দ্যাখেনি, ভূত আছে বলে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু এ যদি ভূতের কাণ্ড না হয় তা হলে···। সে চোখ ফেরাল। ডক্টর গুপ্ত তাতানকে বাক্সবন্দী করছেন। চাপা গলায় অর্জুন ডাকল, "একবার এখানে আসুন।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের মুখ দেখে সম্ভবত অনুমান করেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলেন জানলার পাশে। টায়ার তখনও ঘুরে চলেছে। জলের ভেজা ঘাসে এলোমেলো দাগ পড়ে যাচ্ছে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "যা বলছিলাম তা তো নিজের চোখেই দেখছ। এ তো কিছুই নয়। আপনমনে খেলছে। উৎপাত যখন করে তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

"কী ব্যাপার বলুন তো ?" অর্জুন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

"তোমার কী মনে হয় ?"

"এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড।"

'যা আমরা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না তাকে ভুতুড়ে বলি। তবে তোমার দেখছি সাহস আছে ছোকরা। অজ্ঞান হয়ে যাওনি।"

হয়তো ডক্টর গুপ্ত সঙ্গে আছেন, দিনের আলোও নিভে যায়নি বলেই অর্জুন ভয় পায়নি। এখন শোনামাত্র কেমন ছমছম করতে লাগল। সে তো ডক্টর গুপ্তকেও ভাল করে চেনে না। জগুদাও বা কতটা চেনেন ? এটি একটা হন্টেড বাংলো হতে পারে। ডক্টর গুপ্ত নিজে একজন ড্রাকুলা হতে পারেন। এমন কত গল্পই তো শোনা যায়। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। সে আড়চোখে দেখল ডক্টর গুপ্তের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। যাক ইনি তা হলে ভূত নন। ভূতেদের ছায়া পড়ে না। অর্জুন দেখল টায়ারটা গড়িয়ে সোজা চলে এল গাড়ির পেছনে। যেভাবে নেমেছিল সেইভাবে লাফিয়ে উঠে পড়ল ডিকিতে। কাত হয়ে শুয়ে পড়তেই ডিকি বন্ধ হয়ে গেল। এসব কাণ্ড ঘটল অথচ কোনও মানুষ গাড়ির ধারেকাছে নেই।

ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কখন যাবেন কে জানে কিন্তু এবার বুঝলেন উৎপাত কীভাবে এখানে আসে ?"

অর্জুনের গলার স্বর কেঁপে উঠল, "কে এটা করল ?"

"তাতানের বন্ধু। এখন পর্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি সে করেনি কিন্তু ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি বসো আমি তাতানকে ওপরে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত টেবিল থেকে বাক্সটা তুলে নিলেন।

অর্জুন পাশে এসে দাঁড়াল, "আমি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না। তাতান একটা কুকুর। ওর বন্ধু এভাবে অদৃশ্য হয়ে অমন কাণ্ড কীভাবে করতে পারে ?"

"বন্ধুটি দেহধারণ করতে পারছে না কোনও কারণে।"

"বিদেহী ?"

"বিদেহী মানে আমাদের ধারণায় ভূত। ও তা নয়। তাতানকে আমি যে গ্রহে পাঠিয়েছিলাম, মানে যেখানে গিয়ে তাতানের আকৃতি ছোট হয়ে গেছে, ওর বন্ধু সেখান থেকেই এসেছে। দাঁড়াও, আমি আগে তাতানকে রেখে আসি।" ডক্টর গুপ্ত দ্রুতপায়ে ওপরে চলে গেলেন।

অর্জুন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। এটি ভুতুড়ে কাণ্ড বাবা ! অন্য গ্রহের প্রাণী একটা কুকুরের জন্য এখানে ঘুরঘুর করছে ? পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও প্রাণী আছে বলে সন্দেহ করেন বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু সেটা তো শুধুই সন্দেহ। ডক্টর গুপ্তের কথা যদি সত্যি হয়···। মায়ের কথা মনে পড়ল। তাঁর দেশের বাড়ির অনেক ভুতুড়ে গল্প তিনি শুনিয়েছেন। ঝড় নেই হাওয়া নেই হঠাৎ মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। অথবা দরজা-জানলা হুটহাট করে খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। এ তো প্রায় সেইরকম ব্যাপার। অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল। হঠাৎ দেখল চায়ের কাপ

টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছে। ঠিক চার ফুট উঁচুতে উঠল কাপটা। ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ ছানাবড়া। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাপটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল।

একটু-একটু করে সাহসী হল অর্জুন, নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

কেউ উত্তর দিল না। অর্জুন একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, "আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন ?"

এবারও কোনও জবাব নেই। এই সময় ডক্টর গুপ্ত ওপর থেকে খালি হাতে নেমে আসছিলেন। অর্জুন তাঁকে সতর্ক করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ওঁর পা পড়ল প্লেটের ওপর। ছিটকে গেল সেটা। মেঝেতে পড়ে দু' টুকরো হল। উলটে পড়তে-পড়তে কোনওমতে সামলে নিলেন ডক্টর গুপ্ত। বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কাপ রাখতে গেলে কেন ? এটা কি রাখার জায়গা ?"

সত্যি, বড় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। অর্জুন বলল, "আমি রাখিনি।"

ডক্টর গুপ্ত চোখ ছোট করলেন, "ও। সরি। এভাবে তোমাকে বলা ঠিক হয়নি।" কাপ তুলে তিনি কিচেনে নিয়ে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, "আমার বেসিনটা প্রায় সাড়ে চার ফুট ওপরে। ও নাগাল পাবে না।"

"কাপ ফুট চারেক ওপরে উঠেছিল।" অর্জুন জানাল।

"ঠিকই। আমার বিশ্বাস ওর হাত মাথার ওপরে তুললে চার ফুটের ওপরে যায় না। মুশকিল হল আমি ওর সঙ্গে কোনওরকম কম্যুনিকেট করতে পারছি না। ও বাংলা হিন্দি ইংরেজি অথবা জর্মান ভাষা বোঝে না।"

"কিন্তু এই ঘরে ঢুকল কী করে ?"

"হয়তো শরীরটাকে খুব ছোট করতে পারে। আমার কিচেনের জল যাওয়ার গর্তটা বেশ বড়। তাই দিয়েই আসে।" ডক্টর গুপ্ত চারপাশে তাকিয়ে নিলেন।

"এই সিদ্ধান্তে এলেন কী করে ?"

"বললাম তো চার ফুটের ওপরে যেমন জিনিস আছে সেগুলোতে ও কখনওই হাত দেয় না। আমার দোতলায় ওঠার দরজাটায় এক চিলতেও ফাঁক নেই। ঘরটাও এয়ারটাইট। সেখানে কখনওই ও যায় না।"

"এয়ারটাইট মানে সাউন্ডপ্রুফ ?" অর্জুন কুঁ-কুঁ শব্দটাকে মনে করতে পারল।

"না, সাউন্ডপ্রুফ নয় পুরোপুরি। এই হল আমার সমস্যা। পুলিশের

পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। তোমার কি মনে হয় ? পারবে ?"

এমন সমস্যা এর আগে কোনও সত্যসন্ধানী সমাধান করেছেন বলে অর্জুনের জানা নেই। স্বয়ং অমল্ সোম থাকতেও পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। চট করে না বলতে ইচ্ছে হল না অর্জুনের। সে বলল, "খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি চেষ্টা করতে পারি। তবে ক'দিন এখানে থাকতে হবে।"

"অফকোর্স। স্বচ্ছন্দে থাকো। তোমার দক্ষিণা কত ?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "সেটা নিয়ে এখন কথা না বললেই ভাল হয়।"

"নো। তুমি কাজ করবে আর আমি জানতে পারব না কত পারিশ্রমিক নেবে ? না না, এভাবে হবে না।"

"বেশ। আপনি যা স্থির করবেন তাই নেব। কিন্তু সফল হলে।"

"কবে থেকে এসে থাকছ তুমি ? আমি না হয় শিলিগুড়িতে গিয়ে নিয়ে আসব।"

"আমি কাল থেকেই আসতে চাই। কিন্তু এই প্রলয়ের মধ্যে ফিরব কী করে ?"

"হুম্। আমি ভাবিনি এরকম বৃষ্টি পড়বে। ঠিক আছে, চলো আমি তোমাকে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।" ডক্টর গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সেই সময় মেঝেতে শব্দ হল। ওরা দু'জনেই দেখল একটা চেন সাপের মতো এগিয়ে আসছে। চেনটা যে তাতানের ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবার চেনটা মাটি থেকে খানিক ওপরে দুলতে লাগল। ডক্টর গুপ্ত বলে উঠলেন, "অর্জুন, সাবধান, ও বোধ হয় আমাদের মারতে চাইছে।" বলতে-বলতে তিনি ছুটে ঘরের কোণে রাখা লম্বা টুলের ওপর উঠে বসলেন। অর্জুন নড়ল না। ঠিক করল চেনটা তাকে আঘাত করতে এলেই সে ওটাকে ধরবে। দেখা গেল চেনটা টুলের দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল শূন্যে। তারপর ঘরের এক কোণে ছিটকে পড়ল। অর্থাৎ যে ওটাকে এতক্ষণ নাচাচ্ছিল সে বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অর্জুন উঠে চেনটাকে কুড়িয়ে নিতে ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন, "ভয়ঙ্কর, এই প্রথম ও এমন ব্যবহার করল। আক্রমণাত্মক।"

এই সময় বাইরে কড়-কড় করে বাজ পড়ল। এবং সেইসঙ্গে সারা বাড়িতে এলার্ম বাজতে লাগল। অর্জুন চমকে ডক্টর গুপ্তের দিকে তাকাতেই তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "ঝড়ে বোধ হয় কোনও গাছের ডাল ইলেকট্রিক তারের ওপর ফেলেছে।"

অর্জুন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ালটা দেখতে পেল। না, এদিকের তারে কিছু জড়িয়ে নেই। সে বর্ষাতিটা পরে নিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টিতে চারধার সাদা হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে এগোতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল।

এই বৃষ্টির মধ্যেই একটি মানুষের শরীর দেওয়ালের ওপরে তারের গায়ে ছটফট করছে। সে দ্রুত ফিরে এসে ডক্টর গুপ্তকে বলল, "তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কারেন্ট অফ করে দিন। একটা মানুষ মারা যাবে।"

"মানুষ ?" দরজায় দাঁড়ানো ডক্টর গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "আবার চেষ্টা করেছে বুঝি ? যারা ওখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় তাদের মরাই উচিত।"

"প্লিজ এখন ওসব বলবেন না। অফ করুন তাড়াতাড়ি।" অর্জুন ধমকে উঠল।

ডক্টর গুপ্ত ভেতরে চলে গেলেন। এবং তার খানিক বাদেই অর্জুন দেখল শরীরটা তার থেকে খসে ওপাশে পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক রকমের আহত হয়েছে। নিশ্চয়ই ভোল্টেজ বেশি নয় তাই এতক্ষণ ছটফট করছিল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে বলল, "মেইন গেট খুলে দিন। লোকটাকে দেখা দরকার।"

কিন্তু ঠিক তখনই কানে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল। দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এর মানে লোকটা একা ছিল না। যারা ওকে পাঠিয়েছিল তারাই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। অর্জুনের মনে হল ডক্টর গুপ্তের ঘরে-বাইরে বিপদ। এই সময়টুকু বৃষ্টিতে দাঁড়ালেই অর্জুনের মনে হল জলপাইগুড়িতে যাওয়া যাবে না। অন্তত আজ তো নয়ই।

ঘরে ঢোকার আগে ওভারকোট আর টুপি খুলতেই অনেকটা জল ঝরল। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "কী হে, চেষ্টা করবে নাকি ?"

"আপনার এখানে ফোন নেই ?"

"আছে। কিন্তু অর্ধেক দিন সাড়া দেয় না। ঝড়বৃষ্টি হলে কথাই নেই।"

"তবু দেখুন তো। মিস্টার গাঙ্গুলিকে এখনও ব্যাঙ্কে পাওয়া যাবে।"

"ওপাশে আর-একটি ঘর রয়েছে। সম্ভবত গেস্ট রুম। ফোনটা সেখানে। এখানে ডায়াল করে লাইন পাওয়া যায় না। অপারেটরের সাহায্য নিতে হয়। দেখা গেল টেলিফোনে কোনও সাড়া নেই।

"অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অর্জুন এখানে আজকের রাতটা থাকবে। কাল সকালে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজের ব্যাপারটা মাকে জানানোর জন্য জগুদাকে বলে আসবে। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এই ঘরটি তোমার। আমি ঠিক তোমার মাথার ওপরে শোব। প্রয়োজন পড়লে বিছানার পাশে এই যে বোতাম আছে চাপ দিও, আমার ওখানে অ্যালার্ম বাজবে। যাই, আবার বিদ্যুৎ চালু করি।"

www.Murchona.com

॥ ৩ ॥

ভদ্রলোক চলে গেলে অর্জুন চেয়ারে বসল। থাকার কথা তো ঠিক হল কিন্তু সঙ্গে যে একটা পাজামাও নেই। রাত্রে শোবে কী পরে ? হঠাৎ তার খেয়াল হল তাতানের বন্ধুর কথা। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। সে চারপাশে তাকাল। অন্যগ্রহের সেই ছোট্ট প্রাণী হয়তো এই ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখানে আছ ?"

কেউ সাড়া দিল না।

"তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো। আমি লোক খারাপ নই। মানে, আমরা বন্ধু হতে পারি। বুঝতে পারছ ? আচ্ছা, এবার বলো, তুমি কিভাবে এখানে এসেছ ? তোমার কি কোনও মহাকাশযান আছে ?"

কোনও জবাব নেই। হাল ছেড়ে দিল অর্জুন। এইভাবে একা শূন্যঘরে কাউকে কথা বলতে দেখলে সে তাকে পাগল ভাবত। প্রাণীটা কত ছোট ? ডক্টর গুপ্ত বললেন হাত তুললে চার ফুটের বেশি হবে না। ধরে নেওয়া যেতে পারে মাথায় সে আড়াই থেকে তিন ফুট। ওঃ, এর চেয়ে ছোট প্রাণী পৃথিবীতে ছিল। গালিভার যাদের লিলিপুট বলেছেন। হাজার-হাজার ছিল তারা। হয়তো অন্যগ্রহ থেকে এসেছিল। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদের আকৃতি ছোট হয়। একসময় এই পৃথিবীতেই বিশাল-বিশাল প্রাণী দাপটে ঘুরে বেড়াত। ডাইনোসরাস এখন কোথায় ? এমনকী এখনও যে হাতি দেখে অবাক হতে হয় সেকালে এর আকৃতি ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আদিম মানুষের যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তার পাশে আমাদের পায়ের ছাপ লিলিপুট। আজ থেকে তিন হাজার বছর পরে একটা হাতি যদি গোরুর উচ্চতায় নেমে যায় তা হলে মানুষ তিন ফুটের বেশি লম্বা থাকবে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর বিবর্তনকালের অনেক আগে বিবর্তন শুরু হওয়া অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীই আজ ডক্টর গুপ্তের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধরে নিলে একটা সহজ সমাধান তৈরি হয়।

কিন্তু সেই প্রাণী কোথা থেকে আসছে এবং কেমন ভাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ডক্টর গুপ্ত কি জানেন ? লোকটা বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে অর্জুনের। অথচ কুকুরের চেনটাকে শূন্যে ভাসতে দেখে কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় আগন্তুকের সঙ্গে ডক্টর গুপ্তের সম্পর্ক ভাল নয়। ভেবেচিন্তে কোনও সুরাহা করতে পারছিল না অর্জুন। আজ জলপাইগুড়িতে যেতে পারলে অমল সোমের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলা যেত।

বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছেরা মাথা দোলাচ্ছে পাগলের মতো। অর্জুন চুপচাপ বসে দেখল দিন ফুরিয়ে আসছে। অথচ ঘড়িতে এখন মাত্র তিনটে বাজে। এদিকে ডক্টর গুপ্ত সেই

যে ওপরে গিয়েছেন আর নামেননি।ভদ্রলোক তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্য কেউ ওপরে যাক তা তিনি পছন্দ করেন না। অর্জুন উঠল।

অন্যগ্রহের মানুষটি এখন এ-বাড়িতে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কারণ দীর্ঘ সময় সে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছে না। কিছুদিন আগে অর্জুন রূপশ্রী সিনেমায় একটা খুব পুরনো ছবি দেখেছিল। ইনভিজিব্‌ল ম্যান। ব্যাপারটা কি সেইরকম ? সে নিচের তলার ঘরগুলো দেখতে লাগল। এ-বাড়িতে কাজের লোক পর্যন্ত নেই। সব কিছুই ডক্টর গুপ্তকে করতে হয়। ফলে একটু অগোছালো ভাব চারধারে।

ঠিক চারটের সময় দপ করে আলো নিভে গেল। ঘরের ভেতর এখন পাতলা অন্ধকার। ওপর থেকে ডক্টর গুপ্তের গলা ভেসে এল, "এক মিনিট, জেনারেটার চালিয়ে দিচ্ছি।"

জেনারেটার চালু হওয়ামাত্র আলোকিত হল বাংলো। ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন ওপর থেকে। সোফায় বসে বললেন, "মনে হচ্ছে আজকের রাতটায় আর উপদ্রব হবে না।"

অর্জুন বলল, "কেন মনে হচ্ছে ?"

"খুব সোজা ব্যাপার। পৃথিবীর আকাশে এখন মেঘে-মেঘে ঘষা লেগে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই স্তর ভেদ করে আসাটা খুব ঝুঁকির কাজ। কেউ বোকামি করবে না।"

"আপনি নিশ্চিত, যে আসছে সে অন্যগ্রহের বাসিন্দা ?"

"অবশ্যই।"

"কোন গ্রহ ?"

"আমরা এর অস্তিত্বই জানতাম না যে নামকরণ করব। সূর্যের চারপাশে যেমন পৃথিবী সমেত অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে তেমনই সূর্যের মতো আরও অনেক নক্ষত্র তাদের পরিবার নিয়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইরকম একটি পরিবার থেকে এই উপদ্রবটি এখানে পৌঁছেছে।"

"পৃথিবীতে আসতে ওর কত সময় লাগছে ?"

"এইটেই আমাকে ভাবাচ্ছে। আমি আলোর চেয়ে দ্রুতগামী একটা রকেট তৈরি করেছিলাম। ট্যাকিয়ন রকেট। সেই রকেটে করে তাতানকে মহাকাশে পাঠিয়েছিলাম। রকেটের লক্ষ্য ছিল ৭.৫ আলোকবর্ষ দূরের একটি নক্ষত্রের গ্রহজগৎ। মাত্র ঘন্টা দশেকের মধ্যেই তাতান সেই নক্ষত্রের একটি গ্রহে পৌঁছে যায়।

...তুমি নিশ্চয়ই আলোর গতি জানো ? ডক্টর গুপ্ত প্রশ্ন করলেন।

ব্যাপারটা জানা ছিল অর্জুনের, "এক বছরে, মানে আমাদের এক বছরে আলো মহাকাশে যায় প্রায় ছয় মিলিয়ন মিলিয়ন মাইল।"

"গুড।" খুশি হলেন ডক্টর গুপ্ত।

"আপনি যে তাতানকে রকেটে করে মহাকাশে পাঠালেন, এখানে কি

সেরকম পাঠানোর ব্যবস্থা আছে? আর তার জন্য তো প্রচুর টাকা লাগে।"

অর্জুন অকপটে তার মনের কথা বলে ফেলল।

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "তুমি ঠিক বলেছ। আমার মতো সাধারণ মানুষ অত টাকা পাবে কোথায়? তা ছাড়া একজন সাধারণ নাগরিককে সরকার রকেট ছোঁড়ার অনুমতি দেবেন কেন?"

"তা হলে?" অর্জুন বেশ বিস্মিত হচ্ছিল।

এক মুহূর্ত ভাবলেন ডক্টর গুপ্ত। সম্ভবত অর্জুনকে নিজের কথা বলবেন কি না তাই চিন্তা করলেন। এবার তাঁকে হাসতে দেখা গেল, "অর্জুন, এককালে লোকে গোরুর গাড়ি-ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করত। কলকাতা থেকে দিল্লিতে একদিনে যাওয়ার কথাই ভাবতে পারত না। তারপরে যখন ট্রেন চলল তখন দু' ঘণ্টায় যাওয়ার কথাও কেউ বিশ্বাস করেনি। এখন তো সেটাই জলভাত। এমন দিনও তো আসতে পারে, ছ' মিনিটে আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে যেতে পারি। তাই না?"

"হয়তো!" অর্জুন আর কী বলতে পারে!

"রকেট চালিয়ে মহাকাশে যান পাঠানো এখনকার রীতি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে দুটো আবিষ্কার তা এই রীতি থেকে অবশ্য এগিয়ে। কিন্তু সেটা জানার আগে বল যে জন্য তোমায় নিয়ে এলাম তার কি করলে?"

অর্জুন তাকাল। তারপর বলল, "এত অল্প সময়ে কিছু করা সম্ভব? আপনি বলছেন অন্য গ্রহ থেকে জীব এখানে আসছে। কিভাবে আসছে?"

"ঠিক প্রশ্ন করেছ তুমি। না, সে সাধারণ মহাকাশযানে চেপে আসছে না। এই ব্যাপারটা অন্য অনেক গ্রহে খুব পুরনো বলে বাতিল হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে এই উপদ্রবটি যাওয়া-আসা করছে। তাতানকে সাধারণ মহাকাশযানে পাঠালে ওর সঙ্গে দেখাই হত না। সম-স্তর বলেই যোগাযোগ হয়েছিল। ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো।

"ওপরে?" অর্জুন প্রশ্ন না করে পারল না।

"হ্যাঁ। আমি কাউকে ওপরে নিয়ে যাই না। কিন্তু তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

আচমকা অর্জুন প্রশ্ন করল, "আপনি তো আজই আমাকে প্রথম দেখলেন, ভাল করে চেনেনও না। আপনার গোপন গবেষণার ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা ঘোরালেন। তাঁকে খুব হতভম্ব দেখাল প্রথমটায়। তারপর অকস্মাৎই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন, "গুড। গুড। আমার মন

আরও পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"কীরকম ?"

"খুব সাধারণ ব্যাপার। তোমার মনে অন্য কিছু থাকলে এই প্রশ্ন করতে না। তা ছাড়া তোমাকে নিয়ে আমার কোনও ভয় নেই। যে কোনও দিন মোটরগাড়ি দেখেনি তাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিলেও সে গাড়ি নিয়ে পালাতে পারবে না। চলো।"

ডক্টর গুপ্তর পেছন-পেছন অর্জুন ওপরে উঠল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি বললেন, "একটু সাবধানে আসতে হবে। আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। যদিও মনে হচ্ছে উপদ্রবটি তার গ্রহে ফিরে গেছেন তবু কে জানে এখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছেন কি না। তুমি যখন ভেতরে ঢুকবে তখন তোমার শরীর একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাবে। সামান্য চিনচিন করবে। অশরীরী অস্তিত্বের কাছে সেটা খুবই মারাত্মক অবশ্য। এসো।"

দরজা খুলে ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন। অর্জুন পা বাড়াতেই মনে হল সমস্ত শরীরে ঝিঁঝি ধরে গিয়েছে। অর্থাৎ সে বিদ্যুৎপ্রবাহের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে। কোনওমতে শরীরটা সামনে ঠেলে নিয়ে আসার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও অসুবিধে হয়নি তো ? একটু চিনচিন ? প্রত্যহ এক-দু'বার নিলে জীবনে বাত হবে না তোমার। আমি তো অনেকবার নিই, দ্যাখো, কী ফিট বডি আমার।"

এসব কথায় মন ছিল না অর্জুনের। তার চোখ এখন ঘরের চারপাশে। বেশ লম্বা হলঘর এটি। চারপাশে নানা যন্ত্রপাতি ছড়ানো। এক কোণে জানলার পাশে ফ্রেমের মতো কিছু, যার মুখে আয়না জাতীয় বস্তু লাগানো। তার পাশেই অদ্ভুত টেবিল-চেয়ার। প্রতিবন্ধীদের জন্য যে-ধরনের হুইল চেয়ার তৈরি করা হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ছোট্ট টেবিলও। ডক্টর গুপ্ত জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের জানলার ওপাশে বিদ্যুৎ চমকে বারংবার পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে। ভদ্রলোক দু' হাত মাথার ওপরে তুললেন, "আমাদের পৃথিবী আর মহাকাশের মধ্যে যোগাযোগ এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুকাউয়াট কে লিয়ে খেদ নেহি হ্যায়।"

অর্জুনের মজা লাগল। তা হলে এই ভদ্রলোক টিভিও দেখেন !

ডক্টর গুপ্ত ঘুরে দাঁড়ালেন, "এই হল আমার জায়গা। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। সারাজীবন ধরে তিল-তিল পরিশ্রম করে এটিকে আমি তৈরি করেছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি মহাকাশের অনেকটাই ঘুরে আসতে পারি। ববকে, মানে রকটি সিনক্লেয়ারকে এই ঘরে ঢুকতে দিইনি আমি। সে এই লাইনের লোক। আমার এই ভাঙাচোরা যন্ত্র নিয়ে কোনওমতে যে কাজ করছি আমি, তা দেখতে পেলে সে দেশে ফিরেই বেশ সফিসটিকেটেড মেশিন তৈরি করে ফেলতে পারত। কিন্তু তোমাকে নিয়ে

আমার সেই ভয় নেই। বোসো, বোসো।" হাত বাড়িয়ে সেই চেয়ারটিকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। চেয়ারের তলায় চাকা আছে। সাবধানে না বসলে পিছলে যেতে পারে। অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে সেখানে বসল। ডক্টর গুপ্ত তখন সেই বাক্স থেকে তাতানকে বের করে একটা গামলার মধ্যে রেখেছেন। ঝুঁকে পড়ে চুক-চুক শব্দ করে তাকে ডাকছেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যাটার খুব মন খারাপ দেখছি। একবার গিয়ে এমন মন খারাপ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে উপদ্রবটি এখানে এসেছিল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করব?"

"নিশ্চয়ই।"

"এসব তো সায়েন্স ফিকশনে হয়ে থাকে। স্পিলবার্গ নামের একজন চিত্রপরিচালকও এমন বিষয় নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি।"

মাথা নাড়েন ডক্টর গুপ্ত, "কারেক্ট। পৃথিবী ছাড়া সূর্যের চারপাশে যারা ঘুরছে তাদের আবহাওয়ায় প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। মঙ্গলে তবু একটু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সেখানে জলের অভাবই বোধ হয় এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"তা হলে?"

ডক্টর গুপ্ত বললেন, "দ্যাখো বাবা, বিরাট মহাকাশে সূর্য এবং তার পরিবার এটুসখানি জায়গা নিয়ে থাকে। ওরকম কত সূর্য আর তাদের ঘিরে কত গ্রহ ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। সেই রকম অনেক গ্রহেই দেখা যাবে আমাদের পৃথিবীর মতো আবহাওয়া। সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে থাকায় পৃথিবীতে এমন আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই গ্রহগুলো তাদের সূর্য থেকে ঠিক একই দূরত্বে থাকলে সমান আবহাওয়া পাবে এবং পাচ্ছে। ফলে প্রাণের অস্তিত্ব একশো ভাগ সম্ভব।"

"এর কোনও প্রমাণ আছে?"

"নিশ্চয়ই। সূর্য থেকে ছিটকে আসা গ্রহগুলো স্থিতাবস্থায় আসার পর যখন পৃথিবীতে অ্যামিবার জন্ম হল, সেই সময় থেকে মানুষরে জন্ম পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস আমরা জানি। মহাকাশের অন্য সূর্যগুলো থেকে একই প্রক্রিয়ায় এমন অনেক গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি বছর বয়স্ক। ফলে সেখানে প্রাণ এসেছে আমাদের অনেক আগে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষজাতীয় প্রাণী জন্ম নিয়েছে বহু বহু আগে। তাই তাদের বোধবুদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এটাই তো স্বাভাবিক। তারা ইচ্ছে করলে তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমরা শুধু চাঁদে

মানুষ নামাতে পারি, মঙ্গলে গ্রহ পাঠাতে পারি। হ্যাঁ, বলতে পারো আমি তার থেকে এক ধাপ এগিয়েছি। কিন্তু সেখানে কোন গ্রহের অস্তিত্ব তার নাম জানি না। তাতান যদি কথা বলতে পারত তা হলে সেটা জানা যেত।"

অর্জুন একমনে শুনছিল। ডক্টর গুপ্তের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা তিনি দিতে পারেননি। সে জিজ্ঞেস করল, "মহাকাশে যে মানুষজাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর কথা আপনি বলছেন তারা কি আমাদের মতো দেখতে ?"

"অসম্ভব। হতে পারে না। দাঁড়াও, তোমাকে ছবিগুলো দেখাই।" ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সেখানে দেওয়াল-আলমারি জুড়ে প্রচুর বই রয়েছে। তার একটি বের করে পাতা খুলতে-খুলতে এগিয়ে এলেন, "এটা কিসের ছবি ?"

অর্জুন দেখল বিশাল চেহারার হাতি, সারা শরীরে লোম। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "এটি হল ম্যামথ। আদ্যিকালের হাতি। এখনকার হাতির চেয়ে দেড়গুণ বড় শরীর। এর পাশে চিড়িয়াখানার হাতিদের শিশু বলে মনে হবে। যত দিন যাচ্ছে তত আকার ছোট হচ্ছে। তুমি যদি কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাও তা হলে দেখবে তখনকার মানুষ যেসব পোশাক ব্যবহার করত তাতে তোমার মতো দু'জন ঢুকে যাবে। আমাদের মুঘল সম্রাট যেসব অস্ত্র স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন তা আমাদের পক্ষে তুলে ধরাই বেশ কষ্টকর। তার মানে ওঁদের শরীর আমাদের চেয়ে বড় ছিল। আবার যদি কয়েকশো বছর এগিয়ে যাও তা হলে দেখবে সব কিছু কেমন ছোট-ছোট অথচ তোমার থেকে বেশি বুদ্ধিদীপ্ত। এটাই নিয়ম। পৃথিবীর বাইরে যে প্রাণ, তার জন্ম হয়েছে আমাদের অনেক, অনেক আগে। ফলে সেখানকার প্রাণীর আকার, বিবর্তন মেনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। হয়তো মস্তিষ্ক, উদর, হাত-পা ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের।"

সত্যি, অতবড় হাতি ছবিতেও দেখেনি অর্জুন। শুধু শুঁড় এবং চারটি পা ও লেজ ছাড়া এখনকার হাতির সঙ্গে তেমন মিল নেই। বিশাল লোম, একটা বিকট আকৃতির জন্য ম্যামথকে বেশ বীভৎস বলে মনে হচ্ছিল। বই রেখে দিয়ে ডক্টর গুপ্ত বললেন, "অর্জুন, তোমার নামের সেই বিখ্যাত পাণ্ডবটি স্বর্গে গিয়েছিলেন এ-কথা মহাভারতে আছে। স্বর্গে সময় স্থির হয়ে আছে। স্বর্গটি কোথায় ? কাউকে জিজ্ঞেস করো, সে যত নিরক্ষরই হোক স্বর্গ বললে মাথার ওপরে হাত তুলে দেখাবে। অর্থাৎ স্বর্গ ওই মহাশূন্যে, মাটির নীচে বা পাশাপাশি কোথাও নেই। মানুষকে কিন্তু কেউ বলেনি স্বর্গ মাথার ওপরে আছে। জন্মজন্মান্তর থেকে একটা ধারণা তার

রক্তে সে বয়ে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে। সে পড়েছে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন। নেমে আসা মানে আমাদের ওপরে তাঁরা থাকেন। আর ওপর বলতে তো আকাশ, মহাকাশ। অর্থাৎ, মহাকাশেই কোথাও স্বর্গ আছে যেখানে সময় স্থির হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সূর্যের সংসারের কোনও গ্রহে স্বর্গ নেই। সেখানে তো প্রাণের অস্তিত্বই অসম্ভব। তা হলে অন্য কোথাও, অন্য সূর্যের সংসারে স্বর্গ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। সেখান থেকে মাঝে-মাঝে দেবতারা এই পৃথিবীতে নেমে আসেন।"

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "আসতেন।"

"আসতেন? নো। আসতেন কেন? এখনও আসেন। ওই যে উৎপাতটা তাতানের খোঁজে আসছে, ওকে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামবৃদ্ধরা উপদেবতা বলতেন।"

অর্জুনের খেয়াল হল সে কিছুদিন আগে দানিকেন সাহেবের লেখা কয়েকটা বই পড়েছে এবং ডক্টর গুপ্তের মতো এতবড় বিজ্ঞানী সেইরকম কথাই বলছেন। দানিকেন সাহেবের কথা তুলতেই ডক্টর গুপ্ত হাত নাড়লেন, "যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই অন্য গ্রহের মানুষের কাজ বলে চাপাতে আমি রাজি নই। অর্জুন, আমার গবেষণা দুটো বিষয় নিয়ে। এক, মহাকাশের অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করা। অংশত আমি সফল। তাতানকে আমি পাঠিয়েছিলাম, ওর পেছন-পেছন যে নেমে এসেছে সেই প্রমাণ দিচ্ছে মহাশূন্য প্রাণীহীন নয়।"

"আপনি কীভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলেন?"

"সেটা তোমাকে বলব না। যতক্ষণ না গবেষণা সফল হচ্ছে ততক্ষণ বলা ঠিক হবে না। আমি পৃথিবীকে একবারেই চমকে দিতে চাই।"

"কিছু মনে করবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?"

ডক্টর গুপ্ত যেন রেগে গেলেন। তারপর বললেন, "তুমি মহাশূন্যে যেতে চাও?"

অর্জুন তাতানের দিকে তাকাল। মহাশূন্যে গেলে যদি তার অবস্থা ওই তাতানের মতো হয়ে যায়? লম্বায় চার ইঞ্চি। অসম্ভব। সে মাথা নাড়ল।

ডক্টর গুপ্ত এবার হাসলেন, "ভয় পাচ্ছ মনে হচ্ছে! আরে মহাশূন্যে যাওয়া মানে তাতান হয়ে যাওয়া এমন ভাবছ কেন? তাতান এমন একটা গ্রহে গিয়ে পড়েছিল যেখানে গেলে ওই অবস্থা হয়। তুমি এই সূর্যের সংসারগুলো দেখে এলে পারতে। অবশ্য চাঁদের বাইরে কিছুটা বাদে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তেমন কোনও প্রতিক্রিয়ার খবর এখনও পাননি।"

ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন সেই ক্রেনের মতো দেখতে মেশিনটার কাছে। মেশিনটার গায়ে হাত রেখে বললেন, "এইটে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মানুষকে তার ভবিষ্যৎ জানাতে চাই। আজ তুমি যে

সময়টায় দাঁড়িয়ে আছ সেই সময়টাকে স্থির রেখে আমি, ধরো, দুশো বছর এগিয়ে নিয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুশো বছর বাদে কী ঘটবে তা দেখতে চাইলাম এখনকার মানসিকতা নিয়ে। এটা করতে পারলে ভবিষ্যতে যাঁরা হাত দেখে কুষ্ঠি বিচার করে চলে তাদের জব্দ করা যাবে। আবার মানুষ তার ভবিষ্যতের কাজকর্ম দেখে বর্তমানের ভুল শুধরে নিতে পারবে।"

"এই গবেষণায় কতটুকু এগিয়েছেন ?"

"তেমন কিছু না। এক-দু' পা মাত্র। এদিকে এসো, এই যে সুইচটা দেখছ, এটা টিপলে যন্ত্র চালু হবে এবং তোমার চারপাশের সময়টা চাপ বেঁধে স্থির হয়ে যাবে। এবার দ্বিতীয় বোতামটা টিপলে তোমার ওই সময় সচল হবে। এখানে দ্যাখো, মিটার আছে। বর্ষমিটার। তুমি পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত মিটার ঘোরাতে পারো। অর্থাৎ, ইচ্ছে করলে পাঁচ থেকে পাঁচশো বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারো। কিন্তু এ-জায়গায় আমি সবসময় সাফল্য পাচ্ছি না। একবার হয়েছিল। নাইন্টি ফোরে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। ইতালিকে দু' গোল দিয়েছিল জার্মানি। ফিরে এলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর মেশিনটা কাজ করছে না। প্রথমবারে যা-যা করেছিলাম তা করেও নয়। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্জুন হতভম্ব। নাইন্টি ফোর আসতে এখনও তিন বছর বাকি আছে। হ্যাঁ, সেই সময় আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়ার কথা। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত গোল দিয়েছিল বললেন ? সে-কথাটা তুলতেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "আসলে খেলা শেষ হওয়া অবধি আমি লস অ্যাঞ্জেলিসের স্টেডিয়ামে ছিলাম। গোল দেওয়া হয়ে গেলে, গিয়েছিল তো বলবই।"

"তার মানে আপনি বলছেন ওই টুর্নামেন্টে জার্মানি দু' গোলে ইতালিকে হারাবেই ? এটা এখন থেকে আপনি জানতে পারছেন ?" অর্জুন উত্তেজিত।

মাথা নাড়লেন ডক্টর গুপ্ত, "হ্যাঁ, জানতে পারছি কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছি না। পৃথিবীর কিছু মানুষ সেটা জেনে গেলে ফাটকা খেলবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ভুয়ো জুয়ায় হারাবে। জুয়াড়িরা যদি জেনে যায় জার্মানি জিতে যাবেই, তা হলে ইতালির সমর্থকদের কোটি-কোটি টাকা তারা বেমালুম হজম করে ফেলবে।" হাসলেন তিনি, "এ তো গেল খুব সামান্য দিক। এর বড় দিকটাই আসল চিন্তার ব্যাপার।"

ঠিক এই সময় ঘরের এক কোণে লাল আলো জ্বলে উঠে বিপ-বিপ শব্দ শুরু হল। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। তার মনে হল মহাকাশ থেকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু ডক্টর গুপ্তকে বেশ হতাশ দেখাল, "একটু একা থাকতে দেবে না। এই ঝড়বাদলে অন্ধকারে আবার কে এল ?"

"আপনি বললেন মেঘের আস্তরণ, বিদ্যুতের ঝলকানি থাকায়··· ।"

"এসেছে নীচের গেটে। অবশ্যই গাড়িতে। এখানে হেঁটে কে আর আসবে। চলো, নিচে যাই। দেখি গিয়ে।" ডক্টর গুপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ এই পরিবেশে বেশ ভাল লাগছিল অর্জুনের। বিজ্ঞানের মাধ্যমে কতরকম কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীতে। জলপাইগুড়িতে বসে সেসব কথা জানাই যেত না। জলপাইগুড়ির অনেক মানুষ এখনও বলতে পারবে না কিভাবে টিভি-র পর্দায় ছবি ফোটে, রেডিওতে গান বাজে অথবা টেলিফোনে কথা শোনা যায়! সে ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটার দিকে তাকাল। যন্ত্রটা গোলমাল করছে। নইলে সে ডক্টর গুপ্তকে বলত কাছাকাছি সময় থেকে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে।

সদর দরজা খুলে বাইরের আলো জ্বালাতেই বৃষ্টিভেজা বাগানটার সামান্য অংশ দেখা গেল। ডক্টর গুপ্তের গাড়ির গায়ে অঝোরে জল পড়ছে। কারণ গাড়িটা এখন গাড়ি-বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে। ওটা আগে ওখানে ছিল না।

গাড়ি-বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে ডক্টর গুপ্ত চিৎকার করলেন, "হু ইজ দেয়ার ? কে এসেছেন ? আগে নিজের পরিচিতি জানান।"

পনেরো ফুট দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া, মজবুত গেট, তার ওপর বৃষ্টির শব্দ, ডক্টর গুপ্তের গলা আগন্তুক শুনতে পেল কি না সন্দেহ। ডক্টর গুপ্ত বললেন, "লাউড স্পিকারের কথা কখনও ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে সেরকম একটা কিছু থাকলে ভাল হত।"

কেউ যে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি ভেদ করে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ছে ওপাশের গাছের ওপর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এত রাত্রে আপনার কাছে এর আগে কেউ এসেছেন ?"

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, "সচরাচর নয়। তবে শিলিগুড়ির এক পুলিশ অফিসার এ-পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে-মাঝেই খোঁজখবর নিয়ে যান।"

এই সময় বৃষ্টিটা একটু ধরল। ঝোড়ো বাতাস শব্দ বাড়াচ্ছে গাছের পাতায় আঘাত করে। ডক্টর গুপ্ত চেঁচালেন আবার, "হু ইজ দেয়ার ?"

"প্লিজ ওপেন দ্য গেট। দিস ইন বিল।"

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকাল, "বিল ? মানে ? উইলিয়াম ? উইলিয়াম জোন্স ?" বলেই তিনি ছুটে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে আচমকা।

অর্জুন কোনও বাধা দিতে পারল না। উইলিয়াম জোন্স নিশ্চয়ই ওঁর খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ, নইলে ছুটবেন কেন ? কিন্তু একটা ছাতি সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতেন। গেট খুলে যাচ্ছে। হয়তো রিমোট ডক্টর গুপ্তের পকেটেই ছিল। গাড়ির হেডলাইটের সামনে এখন ডক্টর গুপ্তের শরীর

শিলুট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অর্জুন ভদ্রলোককে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। তিনি চিৎকার করে কিছু বললেন। গাড়ি সটান এগিয়ে আসছে তাঁকে চাপা দেওয়ার জন্য। ডক্টর গুপ্ত একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাড়িটা এবার তার দিকে এগিয়ে আসছে। অর্জুন দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং ঝন-ঝন শব্দ শুরু হয়ে গেল। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই আহত হয়ে বৃষ্টির ভেতর পড়ে আছেন। তাঁকে সাহায্য করতে গেলে বন্দুকবাজদের সামনে পড়তে হবে।

দরজায় আঘাত শুরু হল। ওরা সেটাকে ভাঙতে চাইছে। গাড়িতে ঠিক ক'জন মানুষ ছিল, অন্ধকার এবং বৃষ্টির কারণে বোঝা যায়নি। অর্জুনের মনে হল, আপাতত ডক্টর গুপ্তকে দেখার বদলে তাঁর গবেষণার জিনিসগুলো বাঁচানো বেশি জরুরি। সে দ্রুত দোতলায় উঠে এল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে সেটাকে প্রথমে বন্ধ করতেই শরীরে চিনচিনে অনুভূতি হল। অর্থাৎ কারেন্ট পাস হচ্ছে এখান থেকে। সে ঘরের ভেতর ঢুকে ভাল করে তাকাল। নীচে তখনও সমানে গুলির আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে রেগুলেটরের মতো একটা নব। ওটার গায়ে লেখা আছে এক দুই তিন চার। রেগুলেটরের মার্কিংটা এক নম্বরে রয়েছে। যদি ওটাকে দুই বা তিনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কি এখানকার কারেন্ট আরও তীব্রতর হবে ? সেক্ষেত্রে কেউই এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না। অর্জুন নবটাকে ঘোরাল। দরজার সামনে গিয়ে নিজের শরীর নিয়ে পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। এক নম্বরেই যদি অমন চিনচিনানি হয় তা হলে··· !

এই সময় নীচের দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। হয়ে গেল। ওরা এবার একতলায় ঢুকে পড়বে। ডক্টর গুপ্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করে এখানে ছিলেন কিন্তু কী লাভ হল তাতে ? সামান্য একটা ভুলে সব নষ্ট হতে চলেছে। অর্জুন চুপচাপ দরজা ছেড়ে জানলার কাচের পাশে চলে এল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরের।

এবার দোতলার সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার। কেউ যেন ছিটকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার ধাক্কা হওয়ামাত্র আবার চিৎকার। অর্জুন একটু নিশ্চিন্ত হল। নব ঘুরিয়ে কারেন্ট বাড়ালে নিশ্চয়ই সমস্ত দরজাটাই ইলেক্ট্রিফাইড হয়ে গিয়েছে।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হল। দরজা ভেদ করে একটা গুলি এসে লাগল ঘরের ছাদে। খানিকটা কাঠের টুকরো পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় গুলিটা দরজা ফুটো করে ছুটে এল অনেকটা নীচ দিয়ে। প্রায় অর্জুনের কান ঘেঁষে সেটা লাগল ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটায়। অর্জুন

চমকে গেল এমন যে, মাটিতে না বসে পারল না। তৃতীয় গুলিটা ছুটে গেল ছাদে। কিন্তু ততক্ষণে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুরু হয়েছে ঘরের ভেতর। অর্জুন মুখ তুলে শুনল। আওয়াজটা আসছে ওই ক্রেন জাতীয় যন্ত্রটার শরীর থেকে। গুলিটা লাগার পরই ওর পিস্টন চালু হয়ে গিয়েছে। সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে এঞ্জিনটাকে দেখতে লাগল। ক্রেনের ভেতরে একটা বসার জায়গা আছে। তার সামনে মোটরগাড়ির হুইল। ড্যাশবোর্ডের মতো জায়গায় নানারকম আলো জ্বলছে। ডক্টর গুপ্ত এঞ্জিনটাকে চালু করতে পারছিলেন না, কিন্তু একটা বন্দুকের গুলি আচমকা সঠিক জায়গায় আঘাত করায় ওটা চালু হয়ে গেল। কী তাজ্জব ব্যাপার!

যিনি বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছেন তিনি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। এবার তাঁর গুলি লাগল দরজার ভেতরে তালার গায়ে। ভাল শব্দ হল। অর্জুন জানে লোকটার উদ্দেশ্য এই ঘরে ঢুকে যন্ত্রপাতির দখল নেওয়া। যদি বুদ্ধি করে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢোকে তা হলে বন্দুকের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে একটুও বেগ পেতে হবে না ওদের। এ-অবস্থায় সে কী করতে পারে?

ইতস্তত ভাবতে-ভাবতে অর্জুন মেশিনটার দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় মতলব মাথায় এল। সে চুপচাপ মেশিনের মাঝখানের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। এটিকে কি করে চালু করতে হয় তা সে জানে না। মেশিন থেকে যেরকম শব্দ বের হচ্ছে তাতে মনেই হয় ওটা ইতিমধ্যেই সচল হয়েছে। কিন্তু এখন কী করা যাবে? অর্জুন সামান্য ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের আলোগুলো দেখল। দশ-বিশ-ত্রিশ- পঞ্চাশ-একশো-হাজার- দশ হাজার লেখা রয়েছে যেখানে, তার নীচেই একটা বোতাম। অর্জুন বোতামটাকে টিপতেই বিপ্-বিপ্ শব্দ বাজতে লাগল এবং নম্বরগুলোর একপাশে একটা কাঁটাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল। অর্জুন সেটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করতেই কাঁটাটাকে এক লাফে কুড়ি এবং ত্রিশের মাঝখানে চলে আসতে দেখা গেল। অর্জুনের সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপছিল। মেশিনটা যেন পাগলের মতো আচরণ করছে এখন। এবার তার নজরে এল পাশাপাশি দুটো সুইচ রয়েছে। তার একটাতে চাপ দিল সে উদভ্রান্তের মতো।

॥ ৪ ॥

প্রবল একটা ঝাঁকুনি, মনে হল হাড়গোড় সব ভেঙে যাচ্ছে, অর্জুন বন্ধ চোখে অন্ধকার দেখল। এবং তারপরেই শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল। বাইরে বৃষ্টি হলেও এই ঘরে তো হাওয়া ঢোকার উপায় নেই। সে চোখ খুলতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ওগুলো নিশ্চয়ই তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তার মানে বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু ঘরের ছাদটা কোথায়

গেল ! সে তারা দেখছে কিভাবে ? মাথা ঘোরাতেই সেটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। ঘর কোথায় ? তার চারপাশে তো গাছগাছালি। মাথার ওপরে আকাশ। সামনে সেই ড্যাশবোর্ড, যেখানে এখনও আলো জ্বলছে। শব্দ বাজছে। সে কোথায় চলে এল ? চটপট মেশিন থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল অর্জুন। একটা রাতের পাখি বেশ ভয় পেয়েই ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল দিগন্তে। দু-তিন পা জঙ্গল ভেঙে এগিয়েও কোনও দিশা পেল না সে। শুধু যন্ত্রটা থেকে আসা আওয়াজ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করছে। অর্জুন আবার ফিরে এল ওটার কাছে। কীভাবে আওয়াজটাকে বন্ধ করা যায়। তার মনে পড়ল শেষবার সে যে সুইচটাকে টিপেছিল তার কথা। পাশাপাশি আর-একটি সুইচ আছে। সেটিকে টিপতেই সব শব্দ আচমকা থেমে গেল। সুইচটির গায়ে দ্বিতীয়বার চাপ দিতেই আবার শব্দ চালু হল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে তৃতীয়বার চাপ দিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ সে সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। যন্ত্রটায় সে বসে ছিল। সে ছিল ঘরের মধ্যে। এখন জঙ্গলে। তার মানে সে খুবই বিস্ময়কর এক জায়গায় চলে এসেছে মেশিনের কল্যাণে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র বাহন হল ওই মেশিনটি। অতএব একে হারালে চলবে না। অর্জুন ডালপালা ভেঙে পাতার আড়ালে মেশিনটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখল যাতে চট করে কারও নজরে না পড়ে। অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার পর সে মেশিনটাকে পেছনে রেখে সোজা হাঁটতে লাগল। জায়গাটায় এত বুনো ঝোপ যে, বোঝাই যায় অনেককাল কেউ এদিকে আসেনি। হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মিনিটচারেক হাঁটার পর চোখের সামনে একটা বিশাল রাস্তা দেখতে পেল। তার মনে পড়ল এতবড় রাস্তা সে যখন আমেরিকায় গিয়েছিল তখন দেখেছিল। রাস্তার দু'দিক দিয়ে একসঙ্গে আটখানা গাড়ি স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। মাঝখানে তিরিশ গজ অন্তর তীব্র আলো জ্বলছে।

সে নিজের কবজির দিকে তাকাল। এখন সন্ধে সাতটা, সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ, উনিশশো একানব্বুই। এই সন্ধেবেলায় আকাশ নির্মেঘ। অথচ সেখানে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি জনবসতি আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় নেমে বাঁ না ডান, কোনদিকে হেঁটে যাবে ঠাওর করতে পারছিল না অর্জুন।

হঠাৎ মাথার ওপরে এয়ারবাসের এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যেতে সে চোখ ওপরে তুলল। কী আশ্চর্য, ওটা কী ? নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন একটা আকাশযান যার আকার গোল টুপির মতো, ওই শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল পশ্চিমে। খানিক বাদে পশ্চিম থেকে ওই একই ধরনের যান ওপরে উঠে শূন্যে মিলিয়ে গেল। এগুলো কি প্লেন ? তা হলে তার ডানা কিংবা লেজ কোথায় ?

অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। ডক্টর গুপ্তের মেশিনটা যদি সঠিক কাজ করে তা হলে সে আর তিস্তাপারের ওই বাংলোয় নেই। কিন্তু কোথায় আছে ? এতবড় চওড়া রাস্তায় এই সন্ধেবেলায় গাড়ি ছুটছে না কেন ? সে ঠিক করল রাস্তায় নামবে না। পাশের জঙ্গল দিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল। শুধু জায়গাটা ছাড়ার আগে ভাল করে দেখে রাখল যাতে পরে চিনতে অসুবিধে না হয়। তিন-তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ অদ্ভুতভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গা ঘেঁষে সোজা গেলেই ডক্টর গুপ্তর মেশিনটা পাওয়া যাবে।

অর্জুনের ঘড়িতে যখন ন'টা, মানে রাত্তির ন'টা, তখন পুবের আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন। খুব স্বাভাবিক ভোর, নরম রোদে গাছগাছালি ঝলমল। অর্থাৎ সে সময়ের দিক থেকে অন্তত আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, একটি দিনের পরিমাপে।

দিন শুরু হতেই অদ্ভুত চেহারার গাড়িতে রাস্তাটা ভরে গেল। ষাট কিলোমিটার স্পিডে গাড়িগুলো ছুটছে, একটার সঙ্গে পরেরটার ব্যবধান দশ-বারো ফুটের। পাশাপাশি দু'মুখো রাস্তার সবক'টা লেন এখন একটু-একটু করে ভরে উঠেছে। এই গাড়িগুলোকে যেন কেউ এতক্ষণ আটকে রেখেছিল, ছাড়া পেয়ে সবাই হুড়মুড়িয়ে চলছে। জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হল হুড়মুড়িয়ে শব্দটায় একটা বিশৃঙ্খল মানে বোঝায় কিন্তু গাড়িগুলো যাচ্ছে খুবই শিষ্ট হয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এতগুলো গাড়ি রাস্তায় ছুটছে, কিন্তু একটিও হর্নের আওয়াজ নেই, গাড়ির বিকট শব্দ অথবা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। মাঝে একটি টু-হুইলার বেরিয়ে গেল। জলপাইগুড়িতে অর্জুনের লাল বাইক হলে এতক্ষণে কান ফাটাত। এই রাস্তায় কোনও ফুটপাত নেই। আমেরিকার হাইওয়েগুলোকে যেমন সে দেখেছিল তার সঙ্গে হুবহু মিল। অর্জুনের মনে হল সে নির্ঘাত আমেরিকায় এসে পৌঁছেছে। ওখানকার হাইওয়েতে কেউ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাতে যায় না। চাইলেও গাড়ি থামবে না। অতএব এখানে অর্জুনও সেই চেষ্টা করল না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল।

ঘড়িতে যখন রাত এগারোটা, এখানে তখন চনমনে রোদ্দুর। হঠাৎ জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। একটু ঢালু মাঠের পরে কিছু রঙিন ঘরবাড়ি, তাদের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বোঝা যায় মানুষজন আছে। অনেকটা কৌতূহল নিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতে বিপ-বিপ শব্দ কানে এল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দুটো বাচ্চা মেয়ে দ্রুতগতিতে সাইকেল চালিয়ে তার পা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইকেল দুটো সম্ভবত ফাইবার গ্লাসের। চলে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েই তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে গেল।

অর্জুন বাড়িঘরগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এল। লোকটি ঈষৎ খাটো, পরনে শার্টপ্যান্ট কিন্তু তার সেলাই

অন্যরকম। চোখাচোখি হতে লোকটিকেও অবাক হতে দেখল সে। কী ভাষায় কথা শুরু করবে বুঝতে না পেরে অর্জুন হাসল। তারপর ইংরেজির আশ্রয় নিল, 'গুড মর্নিং'।

লোকটি ঠোঁট কামড়াল। তারপর ঘুরে ভেতরে চলে গেল। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। নিশ্চয়ই ও ইংরেজি জানে না। ইংরেজি না-জানা সভ্য দেশ ইউরোপে অনেক আছে। কিন্তু এই লোকটিকে দেখে মোটেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে না। চিন বা জাপানের সাধারণ মানুষও ইংরেজিতে কথা বলা দরকার বলে মনে করে না। সাধারণত যেসব দেশ এককালে ব্রিটিশদের অধীনে ছিল তারাই ইংরেজি শিখেছে বাধ্য হয়ে।

অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে কি না ভাবছিল এমন সময় সেই লোকটি আবার বেরিয়ে এল এক বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে। বৃদ্ধের পাকা দাড়ি, লম্বা চুল আবার জিনসের প্যান্ট এবং কায়দা-করা শার্ট, সব মিলিয়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্জুন খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করল।

বৃদ্ধ হাসলেন এবং নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন। তারপর হাত নেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। অর্জুন ওঁদের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকল। সুন্দর সাজানো একটি ঘর। এবং দেওয়ালের একটি ছবির দিকে তাকাতেই সে খুব অবাক হয়ে গেল। ছবিটা কাচে বাঁধানো নয়, পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা।

সে প্রশ্ন না করে পারল না, "রবীন্দ্রনাথ টেগোর ?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "টেগোর ? না। ঠাকুর। আমাদের পরমপিতা।"

"আ-আপনি বাঙালি ?"

"বাঙালি ? হ্যাঁ, আমরা বঙ্গভাষাভাষী। প্রায় দুশো বছর আগে পরমপিতা পৃথিবীতে এসেছিলেন। আমাদের যা কিছু গৌরব তা ওঁরই দান।" বৃদ্ধ হাসলেন, "আপনি বঙ্গভাষা জানেন জেনে খুশি হলাম। আপনার নিবাস ?"

"আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে।"

বৃদ্ধ যেন খুব অবাক হলেন। তিনি সঙ্গীর দিকে তাকালেন। সঙ্গীর চোখ ছোট হল। বৃদ্ধ ইঙ্গিতে অর্জুনকে বসতে বললেন, "মনে হচ্ছে আপনি আপাতত অনেকদূর পথ ভ্রমণ করেছেন। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে ?"

অর্জুন একটি সুদৃশ্য চেয়ারে বসল। তারপর মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বৃদ্ধ তাঁর সঙ্গীকে ইশারা করতে সে ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেল। বৃদ্ধ এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার পোশাক দেখছি প্রায় নতুন। আমাদের বালক বয়সে ওইরকম কাপড়ের পোশাক দেখেছি। আপনি কোত্থেকে এগুলো সংগ্রহ করলেন ?"

এই বৃদ্ধ তাঁর ছেলেবেলায় এমন জামাপ্যান্ট দেখেছে ? লোকটার মাথা

ঠিক আছে তো ? সে হেসে বলল, "আমি দোকান থেকেই কিনেছি।"

এই সময় সেই যুবক বেরিয়ে এসে বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কিছু বলল। বৃদ্ধ ব্যস্ত হলেন, "আপনাকে দেখে খুব ভাল লাগল। আপাতত এই ঘরে বিশ্রাম নিন। বাইরের রোদ হয়তো আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমাকে এখনই একটু বিশেষ কাজে বেরোতে হবে। ততক্ষণ পুত্র আপনাকে দেখাশোনা করবে।" বৃদ্ধ তড়িঘড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অর্জুনকে অবাক হতে দেখে যুবক বলল, "বাবার একটা জরুরি কাজ আছে মিনিট দশেকের মধ্যে। উনি সেটা খেয়াল করেননি।"

এই সময় ঘরে মিষ্টি বাজনা বাজতে লাগল। যুবক উঠে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লাগানো একটা সুইচ টিপতেই সেখানে সিনেমার পর্দার মত আলো ফুটে উঠল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। চৌকো আলোর মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ ভেসে উঠল, "বাবা বেরিয়ে গেছে দাদা ?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র। আমি মনে করিয়ে দিলাম।" যুবকের দেওয়ালের দিকে মুখ।

"আজকাল বাবার যে কী হচ্ছে ! তুমি কী করছ ?"

"একজন অতিথি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছি।"

"অতিথি ? কে ? আমি চিনি ?"

"না। মানে সম্ভবত না। তিনি বলছেন জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন।" কথাটা বলেই যুবক হাসল। সুন্দরী বেশ অবাক, "কী যা-তা বলছ ?"

"আমি ঠিকই বলছি।"

অর্জুন শুনতে পেল সুন্দরী চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "মাথা ঠিক আছে ?"

"এখনও বুঝতে পারছি না। কখন ছুটি হচ্ছে ?"

"আধঘণ্টার মধ্যেই। ঠিক আছে !"

"ঠিক আছে।" দেওয়ালের আলো মিলিয়ে গেল। যুবক সুইচ অফ করে ফিরে এসে হাসল, "আমার বোন। ওর রাতের চাকরি।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার মুখ থেকে প্রশ্ন ছিটকে বের হল, "উনি আপনার সঙ্গে কীভাবে কথা বললেন ?"

"কেন ? এই পদ্ধতি আপনি আগে দেখেননি ?"

"না। আমরা টেলিফোনে কথা বলি। সেখানে শোনা যায়, দেখা যায় না।"

"আমরা শ্রবণ এবং দর্শন একই সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আচ্ছা, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন তো, এখানে আসার ঠিক আগে কোথায় ছিলেন ?"

"কোথায় ছিলেন মানে ?"

"কোনও চিকিৎসালয়ের কথা আপনার কি মনে পড়ে ?"

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। এদের কাছে তার কথা, পোশাক, আচরণ নিশ্চয়ই অন্যরকম লাগছে। স্বভাবতই এরা ভাবতে পারে সে কোনও মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। এই ভাবনাটা ওদের বেশি বিচলিত না হতে সাহায্য করছে। অতএব এদের ভুল না ভাঙানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সে অভিনয় করল, "আমার মাথায় যন্ত্রণা হত খুব। তবে আজ সকাল থেকে সেই যন্ত্রণা আর নেই।"

"আপনার বাবা-মা-স্ত্রী অথবা বাড়ির ঠিকানা মনে আছে ?"

"না। কিছুই মনে করতে পারছি না। তবে শরীর খুব ভাল লাগছে।"

"এই পোশাকগুলো আপনি পেলেন কী করে ? কোনও চিকিৎসালয়ে তো এমন পোশাক ব্যবহার করতে দেবে না। সেখানে কি মজাদার পোশাক পরার কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল। মনে করে দেখুন !"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেরকম একটা কিছু··· ।"

যুবক এবার গম্ভীর হল, "দেখুন, একজন নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য এখনই জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি আমার বাবার অতিথি। তা ছাড়া বলছেন আপনার শরীর ভাল আছে। অনেক সময় অবশ্য বাইরের আলো হাওয়া খুব কাজে দেয়। দাঁড়ান, আপনার খাবার নিয়ে আসি।" যুবক ভেতরে চলে গেল।

অর্জুন কিছুক্ষণ একা-একা আকাশপাতাল ভাবল। তার নিজেকে উন্মাদ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছিল না। যুবক ফিরল একটা সুন্দর ট্রেতে খাবার নিয়ে। অর্জুনের সামনের টেবিলে ট্রেটা বসিয়ে দিয়ে বলল, "মোটামুটি এই বাড়িতে ছিল।"

অর্জুন দেখল এক বাটি সুপ, অনেকখানি সবজি সেদ্ধ আর গোল ফুলকো রুটি দু'খানা প্লেটে রয়েছে। সে চুপচাপ খেয়ে গেল। খিদে যে মারাত্মক পেয়েছিল তা খাবার মুখে দিতে মালুম হল। এমন স্বাদহীন খাবার শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। খাবার শেষ করা মাত্র দরজায় শব্দ হল। এবং দেওয়ালে যার ছবি দেখেছিল সেই সুন্দরীকে ভেতরে ঢুকতে দেখল সে। সুন্দরী ঘরে ঢুকেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। যুবক বলল, "আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন বলাকা। আপনার নামটা জানা হয়নি।"

"অর্জুন।" সে দুই হাত যুক্ত করল নমস্কার জানাতে। বলাকা স্বচ্ছন্দে এগিয়ে এসে ডান হাত বাড়িয়ে অর্জুনের আঙুল স্পর্শ করল, "আপনার বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদার খুব ভক্ত।"

"চিত্রাঙ্গদা ? অর্জুন হতভম্ব ।

"নইলে অর্জুন নামটি তারা রাখতেন না, তাই না ?"

এবার বুঝল অর্জুন । বলাকা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কথা বলছে ।

বলাকা এবার তার দাদার দিকে তাকাল, "আমি দুটো প্রবেশপত্র পেয়েছি । আর ঠিক এক ঘন্টা বাদে লন্ডনে খেলা শুরু হবে ।"

যুবক বলল, "ক্রিকেট আমার ভাল লাগে না । ফুটবল হলে যেতাম ।" সে এবার অর্জুনের দিকে তাকাল, "আপনি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাবেন ?"

"কোথায় হচ্ছে ?" অর্জুন ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল ।

"লন্ডনে । ভারত বনাম ইংল্যান্ড ।" বলাকা বলল, "এ-খবর আপনি জানেন না ?"

যুবক নিচু গলায় বলল, "ওর জানার কথা নয় ।"

"আমার কাছে একটি অতিরিক্ত প্রবেশপত্র আছে । যেতে চাইলে সঙ্গে আসুন ।"

এই ঘর থেকে বেরনো যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না, অর্জুন তাই উঠে দাঁড়াল । যুবক জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কখন ফিরছ ?"

বলাকা জবাব দিল, "দু' ঘন্টার তো খেলা, শেষ হলেই ফিরব ।"

বলাকাকে অনুসরণ করে অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে ভেবে পাচ্ছিল না ক্রিকেট কি করে দু' ঘন্টার খেলা হবে ? পাঁচদিনের টেস্ট, তিনদিনের ম্যাচ থেকে এখন ওয়ান ডে-তে এসেছে । অথচ বলাকা বলছে দু' ঘন্টার খেলা ।

পার্কিং লটে একটা লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে । দরজা খুলে সেটায় উঠে বসে পাশের দরজা বোতাম টিপে খুলে দিল বলাকা । অর্জুন দেখল গাড়িতে গীয়ার নেই, ক্ল্যাচ নেই । সুইচ অন করে একটা বোতাম টিপতে গাড়ি ভুস করে ছুটে চলল । কয়েক সেকেন্ডেই হাইওয়ে । হঠাৎ মাথার ওপরে একটা বিরাট হোর্ডিং নজরে এল, "জলপাইগুড়ি শহরে সুস্বাগতম ।"

জলপাইগুড়ি শহর ? অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এটা জলপাইগুড়ি শহর নাকি ? যে-শহরে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তার কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না ? এতবড় হাইওয়ে করে জলপাইগুড়িতে ছিল ? শহরের মধ্যে সরু ঘিঞ্জি কিছু রাস্তায় যাতায়াত করত সবাই ।

সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা নদীটা কোন দিকে ?"

বলাকা হাসল, "শুনলাম আপনি বলেছেন যে, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি, তিস্তা নদীর কী অবস্থা তা জানেন না ।"

অর্জুন বুঝল । কেন বৃদ্ধ এবং যুবক তার কথা শুনে অমন অবাক হয়েছিল । তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমাকে সত্যি কথা বলুন তো ? আপনার পরিচয় কী ?"

অর্জুন হাসল। সত্যি কথা বলে কোনও লাভ নেই। কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। সে মাথা নাড়ল, "আমার কোনও কথাই মনে পড়ছে না।"

"কোনও কষ্ট হচ্ছে?"

"বিন্দুমাত্র নয়।"

পিলপিল করে গাড়ি ছুটে চলেছে। নানা ধরনের গাড়ি, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। দিনটা ভালই। বলাকা বলল, "আমরা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি। আপনি তিস্তার কথা বলছিলেন, এই দেখুন।

বলাকার আঙুল অনুসরণ করে অর্জুন দেখল একটা বড় নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, "আপনারা তিস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।"

মানে? বলাকা যা বলল তা হল, এককালে তিস্তা নাকি সারা বছর শুকিয়ে থাকত। অনেকখানি জায়গা শহরের পাশে বালির চর হয়ে পড়ে নষ্ট হত। মাঝে-মাঝে বর্ষায় বন্যা হত এই যা। বেশ কিছু বছর আগে পাহাড় থেকে যেখানে তিস্তা নীচে নামছে সেখান থেকেই মাটির তলায় বিশাল টানেল করে নদীর জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকায় সারাবছর সেখানে জল থাকে। স্রোতও। ফলে ভাল বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আর ওপরের বালি জমিকে নানান কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। শহরের পাশে সেই বিরাট চরেই গড়ে উঠেছে খেলাধুলোর নানান বেরা মাঠ।

পেটের ভেতর চিনচিন করতে লাগল অর্জুনের। সেই বিখ্যাত চর উধাও? তিস্তা-ব্রিজের দরকার নেই। এখানে স্টেডিয়াম হয়েছে। জলপাইগুড়িতে স্টেডিয়াম বলতে ছিল কয়েকটা গ্যালারি নিয়ে হাকিমপাড়ার টাউন ক্লাব। আর বলাকা যেখানে গাড়ি পার্ক করল, লম্বা ট্রলি জাতীয় গাড়ি তাদের তুলে নিয়ে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে আমাদের অর্ধেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল স্টেডিয়াম। কবে হল এসব? এত লোক আজ খেলা দেখতে এসেছে তবু ঝামেলা হচ্ছে না এতটুকু! প্রবেশপত্র দেখিয়ে মাঠে ঢোকা হতে চোখ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। এমন সবুজ মাঠ, ঝকঝকে স্টেডিয়াম সে কখনও দেখেনি। মাঠের দু'দিকে স্কোরবোর্ড রয়েছে। আর একপাশে বিশাল একটা ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্র মাঠের দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। গ্যালারি ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে।

এই সময় আকাশবাণী শোনা গেল, "প্রিয় বন্ধুগণ, আর কিছুক্ষণ বাদেই ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। দুই দলে যাঁরা খেলছেন তাঁদের নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তবু আর-একবার জানানো হচ্ছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক স্বপনলাল। দলে আছেন····।"

অর্জুন কান পেতে শুনল। একটি নামও তার চেনা বলে মনে হল না। পাশে বসা বলাকাকে সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "শচীন খেলছে না ?"

"কে শচীন ?"

"শচীন তেন্ডুলকর। বিস্ময়-বালক।"

"বিস্ময়-বালক মানে ? এরকম নাম তো কখনও শুনিনি।" বলাকা অবাক।

অর্জুনের ডান দিকে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, "শচীন তেন্ডুলকর ? নামটা কিন্তু কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।"

তাঁর ওপাশে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, "অনেকদিন আগে ওইরকম নামের এক ভদ্রলোক নাটক লিখতেন। মারাঠি ভাষায়।"

"কতদিন আগে ?" প্রথম বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

"সময়টা ঠিক মনে নেই। নাটকের ওপর একসময় পড়াশোনা করেছিলাম। তখন পড়েছিলাম। তবে প্রথম নামটা নিশ্চয়ই শচীন নয়।" দ্বিতীয় বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। আকাশবাণী হল, "খেলা শুরু হচ্ছে। এখন আমরা আপনাদের সামনে লর্ডস মাঠকে উপস্থিত করছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের একপাশে দাঁড় করানো ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্রটা চালু হল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল স্টেডিয়ামের মাঝখানে মাঠটা মুহূর্তেই বদলে গিয়ে লর্ডস মাঠে পরিণত হল। আম্পায়ার দুই অধিনায়ককে দিয়ে টস করাচ্ছেন। ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ঘন্টার ব্যাটিং নিল। এই মুহূর্তে লর্ডসে বসে থাকলে সে যেমনটি দেখত, জলপাইগুড়িতে বসে ঠিক তেমনই দেখছে। মাঠ, খেলোয়াড়। এক শুধু দর্শকরা পালটে গেছে। সে বলাকাকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, "অত হাজার মাইল দূরে যে খেলা হচ্ছে তা এই মাঠে কী করে দেখানো সম্ভব ?"

বলাকা হাসল, "আপনি সত্যি সব ভুলে গেছেন ! আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা ঘরে বসে লর্ডসের খেলা দূরদর্শন যন্ত্রে দেখতেন। সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল ? শুধু চারচৌকো বাক্সের পরদায় ছবিটাকে না রেখে এই বড় মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মেজাজটা ভাল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্তত তিনশোটা মাঠে একই সঙ্গে মানুষ খেলাটা দেখতে পাচ্ছে।"

খেলা চলাকালীন এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিল অর্জুন যে, অন্যদিকে মন ছিল না। প্রথম ঘন্টায় ইংল্যান্ড আশি রান করল তিন উইকেট হারিয়ে। ভারত বল করেছে কুড়ি ওভার। দ্বিতীয় ঘন্টার জন্য ভারত নেমেই একটা উইকেট খোয়াল। সমস্ত স্টেডিয়াম জুড়ে হাহাকার। ইংল্যান্ড উনিশ

ওভার বল করলে ভারত রান তুলল তিন উইকেটে ছিয়াত্তর। খেলা শেষ। কিন্তু যেহেতু ইংল্যান্ড এক ওভার কম বল করেছে তাই ভারত চার রান বোনাস পেল। ফলে দুই দলের স্কোর হয়ে গেল সমান-সমান, আশি। ম্যাচ ড্র। বলাকা বলল, "আজকাল প্রায়ই দেখছি ম্যাচ ড্র হচ্ছে। চলুন।"

অর্জুন নিজের ঘড়ির দিকে তাকাতে পুরনো সময় দেখতে পেল। বলাকার চোখ পড়েছিল তার ঘড়ির ওপর। সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, "ও মা, এ কীরকম ঘড়ি আপনার ? দেখি, দেখি।

বাধ্য হয়ে নিজের কবজিটাকে তুলে ধরল অর্জুন। বলাকা সেটাকে দেখতে-দেখতে বলল, "খুব দাম হবে ঘড়িটার। পুরনো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার ঘড়ি যে উলটোপালটা সময় দিচ্ছে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক করা হয়নি।"

"কিন্তু তারিখটা ? কী লেখা আছে ?"

অর্জুন ইংরেজিতে তারিখটা দেখল। এবং তখনই খেয়াল হল এখানে আসার পর থেকে সে একটিও ইংরেজি শব্দ শুনতে পায়নি। বলাকাদের পরিবারের কেউই কথার মধ্যে ইংরেজি বলেনি। হয়তো এখানে কেউ ইংরেজি শেখে না। এই কারণেই বলাকা পড়তে পারছেনা তারিখটা, সে দেখল অদ্ভুত দৃষ্টিতে বলাকা তাকে দেখছে। একটা কিছু জবাব দিতেই হয়। কিন্তু তার আগেই বলাকা বলল, "নিশ্চয়ই এটাও আপনার মনে পড়ছে না। চলুন।"

বলাকার পেছন-পেছন হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল মেয়েটা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবার বেজায় সন্দেহ করছে, সে কী করে এদের বোঝাবে উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ির কাছে একটা বাংলোয় ছিল ! আর এখন ঠিক কোন সাল তাই তো বোঝা যাচ্ছে না।

গাড়িগুলো ফিরছিল। হাইওয়ের গায়ে মাঝে-মাঝে লেখা, ডান দিকের সরু পথ দিয়ে জলযোগকেন্দ্র, বিশ্রামালয়। তিন নম্বর বাহিরপথ বিমানবন্দরের জন্য। বিমানবন্দর ? জলপাইগুড়ি শহরে এয়ারপোর্ট আছে নাকি ?

হঠাৎ বলাকা বলল, "আপনি এতক্ষণ আমাদের সঠিক কথা বলেননি। হতে পারে আপনার মস্তিষ্ক স্থির নেই কিন্তু আপনার পোশাক, ঘড়ি, কথাবার্তায় এখনকার কিছুই ধরা পড়ছে না। আপনাকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগে আপনাকে আমি জলপাইগুড়ি শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব। কথা বলতে-বলতেই বলাকা হাইওয়ে থেকে শহরে যাওয়ার পথ ধরে ডান দিকে বাঁক নিল। অর্জুনের মনে পড়ল আমেরিকার হাইওয়েতে এইরকম পথগুলোকে এগজিট বলে। গঠনটা ঠিক একই ধাঁচের, বাঁ দিকের কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে

বলাকা গাড়ির বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চার ইঞ্চিটাক টিভি স্ক্রিন বেরিয়ে এল ড্যাশ বোর্ডের একধারে। বাজনা বাজছে কোথাও। এবারেই সেই স্ক্রিনে বলাকার দাদাকে দেখা গেল, "কী ব্যাপার ?"

"বাবা ফিরেছেন ?"

"হ্যাঁ। একটু আগে। তোমরা কোথায় ?

"ছয় নম্বর বাহির পথে। আমরা একটু শহরে যাচ্ছি।"

"কেন ?"

"অর্জুনকে শহর দেখাব।"

একটু সতর্ক থেকো। বাবা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা অত্যন্ত কৌতূহলী হয়েছেন। ঠিক এক ঘন্টা বাদে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সবাই এখানে আসছেন। এর ভেতরেই চলে এসো।" আলো নিভে গেল। বলাকা সুইচ টিপে স্ক্রিনটাকে আবার ভেতরে চালান করে দিয়ে বলল, "শুনলেন তো ? এবার সত্যি কথা না বলে আপনার কোনও উপায় নেই। এই শহরের কোথাও আপনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারেন।"

অর্জুনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলাকা যে একটুও মিথ্যে বলছে না তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু কী করে সঠিক ব্যাপারটা সে বোঝাবে। বলাকা আবার গাড়ি চালু করে গুনগুন করে সুর ধরল, আজ আমি যে কিছু চাহি না।" হঠাৎই সে থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল, "পরের লাইনটা কী বলুন তো ?"

অর্জুনের মনে পড়ল দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সে শুনেছে। মনে করেই সে জবাব দিল, "জননী বলে শুধু ডাকিব।"

"বাঃ। খুব ভাল। এবার বলুন।"

গাড়ি এখন শহরের মধ্যে ঢুকছে, সব পালটে গেছে, সব। যদি অতবড় তিস্তা নদীকে ছোট করে পাতালনদী করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে শহরটার ভোল পালটাবেই। সে জিজ্ঞেস করল, "করলা নদী কোথায় "

"করলা ? সেটা আবার কী ?

অর্জুন এবার মরিয়া হল। যা হওয়ার হোক, বলাকাকে ব্যাপারটা বলা দরকার। সে বলল, "অনুগ্রহ করে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাবেন যেখানে আমরা কথা বলতে পারি ?"

বলাকা ওর দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল। দু'পাশে বড়-বড় ঝকঝকে বাড়ি। মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলছে। সব আধুনিক গাড়ি। একটা সিঁড়ি দিয়ে কিছু লোক নীচে নেমে গেল, তার মানে এখানে পাতালরেলও রয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরেরএকটি বাড়ি বা দোকানকে সে এখন কোথাও দেখতে পাচ্ছে না।

এখন পার্কিং প্লেস পাওয়া খুবই মুশকিল, বলাকা আধ ঘন্টার জন্য

একটা জায়গায় গাড়ি রেখে পাশের রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে ঢুকল। রেস্টুরেন্টে একজনই কর্মচারী। থরে-থরে খাবার সাজানো আছে। মানুষজন সেগুলো প্লেটে তুলে কর্মচারীটিকে দাম দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসছে। এমন ঝকঝকে রেস্টুরেন্ট জলপাইগুড়িতে কখনও ছিল না।

দু' কাপ কফি নিল বলাকা। নিল মানে গরম কফির লিকার কাপে ঢেলে চিনি মিশিয়ে নিল, দুধ ঢালল না। তারপর ট্রে হাতে এগিয়ে গেল দাম দেওয়ার জন্য। অর্জুনের মনে হল বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এরা এর মধ্যে প্রচুর উপকার করেছে তার। অতএব কফির দাম তারই দেওয়া উচিত।

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলাকা কিছু বলার আগেই সে কর্মচারীটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "দুটো কফির দাম কত ?"

"দু' হাজার।" কর্মচারী জবাব দিল।

হকচকিয়ে গেল অর্জুন। দু' হাজার টাকা দু' কাপ কফির দাম ? তার কাছে তো অত টাকা নেই। পেছন থেকে বলাকা বলল, "আপনি সরে দাঁড়ান, আমি দিচ্ছি।" ট্রে-টাকে পাশের টেবিলে রেখে সে নিজের ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে কর্মচারীটিকে দিতেই ভদ্রলোক মেশিনে সেটা পাঞ্চ করে ফিরিয়ে দিল।

রেস্টুরেন্টের এক কোণে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে বলাকা জিজ্ঞেস করল, "আপনার হাতে ওটা কী ?"

দশ টাকার নোট তখনও হাতেই ছিল, সেটা নিঃশব্দে এগিয়ে দিল অর্জুন। বলাকা সবিস্ময়ে সেটাকে দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "এটা কোথায় পেলেন ?"

"আমার কাছেই ছিল। আমাদের সময় এই দশ টাকায় পাঁচ কাপ কফি পাওয়া যেত।"

"আপনাদের সময় মানে ?"

"উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ। আপনাকে আমি সব কথা খুলে বলছি। তার আগে বলুন, এটা কোন সাল, মাস, খ্রিস্টাব্দ ?"

"আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আজ চব্বিশে বৈশাখ, পনেরোশো আটষট্টি সাল।" বলাকা জবাব দিল।

"তার মানে, কাল পঁচিশে বৈশাখ ? রবীন্দ্রনাথের তিনশো বছর পূর্ণ হবে ?"

"হ্যাঁ। কাল আমাদের বিরাট উৎসব।"

অর্জুন মনে-মনে হিসাব করল, বলাকার কথা যদি ঠিক হয় তা হলে সে একশো সত্তর বছর পরের জলপাইগুড়ি শহরে বসে আছে। তার মানে ডক্টর গুপ্তের মেশিন তাকে একশো সত্তর বছর ভবিষ্যতে নিয়ে এসেছে। সে ধীরে-ধীরে সব কথা বলাকাকে খুলে বলল।

শুনতে-শুনতে বলাকা খুব উত্তেজিত, "আপনি প্রমাণ দিতে পারবেন ?"

"নিশ্চয়ই। এই পোশাক উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা পরি। এই ঘড়ি তখন স্বাভাবিক ছিল। এই যে নোট দেখছেন, এটা দশ টাকার, তখন সারা ভারতবর্ষে এটাই চালু ছিল।" অর্জুন বোঝাতে চাইল।

বলাকা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার এখন বয়স কত ?"

"অর্জুন জবাব দিল, "তেরোশো আটানব্বই সালে বাইশ বছর ছিল।"

"তা হলে তো এখন একশো বিরানব্বই হয়েছে ?"

"হয়নি, কারণ আমি এক মুহূর্তে এখানে এসেছি। আপনি মহাভারত পড়েছেন ? মহাভারতে অর্জুন নামে একজন বীর ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন আচমকাই, জীবিত অবস্থায়। সেখানে থাকার সময় তার বয়স বাড়েনি।"

"মহাভারত ? নাম শুনেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় আমাদের নেই। ওঁর গানই আমাদের পুজোর মন্ত্র। কী অদ্ভুত লাগছে আপনাকে দেখে, সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"প্লিজ সেটা করবেন না, আমার বিপদ হবে।"

"প্রথম শব্দটা কী বললেন ?"

"প্লিজ, মানে অনুগ্রহ করে। এটি ইংরেজি শব্দ।"

"ও, ব্রিটিশদের ভাষা। আমরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলি না।"

"কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ, তার ভাষাও অনেক···।"

"নিশ্চয়ই। শুনেছি এই কারণে এক সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা হত। কেউ-কেউ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল প্রত্যেক প্রদেশকে একমাত্র বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধিকার দেওয়া হবে। এর পরে আর কোনও সমস্যা নেই। দেশের মধ্যে আমরা সাধারণত নিজেদের নিয়ম মেনে চলি। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্যি হয় তা হলে আপনি আমার পূর্বপুরুষ ?" অদ্ভুত চোখে তাকাল বলাকা।

অর্জুনের লজ্জা হল। বলাকা তার সমবয়সী বলা যায়।

"আপনি সত্যি এই শহরে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ। শহরটা তখন এরকম ছিল না।"

"কীরকম ছিল ?"

"মফস্বল শহর যেমন হয়। হাইওয়ে ছিল না। একটা বাইপাস ছিল। নদী ছিল বিশাল এবং প্রায়ই জল থাকত না। উনিশশো আটষট্টি খ্রিস্টাব্দের বন্যার পর শহরটা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তিন-চারতলা বাড়ি হাতে গোনা যেত। মানুষজন ছিল ভাল, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ

সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল। তখন লন্ডনে খেলা হলে আমরা টিভিতে দেখতে পেতাম।"

বলাকা বলল, "আমি আপনার এসব কথা অনুমানও করতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে ইতিহাস-ঘরে চলুন।"

"ইতিহাস-ঘর ?"

"হ্যাঁ। আমাদের শহরের যাবতীয় অতীতের তথ্য সেখানে রাখা আছে। যদিও আমার হাতে বেশি সময় নেই, তবু আপনার কথা জানার পর যেতে ইচ্ছে করছে।"

কফির কাপ এবং ট্রে একটি বিশেষ বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে বলাকা অর্জুনকে নিয়ে বের হল। গাড়ি মিনিট-তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল একটা দশ তলা বাড়ির সামনে। নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলাকা সেখানকার ছুটন্ত সিঁড়িতে চেপে অর্জুনকে নিয়ে সাত তলায় পৌঁছে গেল। দরজার ওপর লেখা আছে, অতীত দু'শো বছর। নিস্তব্ধ বিশাল হলঘর। শীর্ণদেহ কিন্তু খুব স্মার্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, "কোনও সাহায্যে আসতে পারি ?"

"হ্যাঁ। আমরা এই শহরটার অতীত সম্পর্কে জানতে চাই।"

"কী জানতে চান আপনারা ?"

"শহরটা তৈরি হয়েছিল কবে ?"

"জলপাইগুড়ির মূল শহর তৈরি হয় কয়েকশো বছর আগে, পুনর্গঠিত হয় আশি বছর।" বৃদ্ধ ওদের নিয়ে একটা বড় ডেস্কের সামনে চলে এলেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "উনিশশো একানব্বই মানে তেরোশো আটানব্বই সালের জলপাইগুড়ি সম্পর্কে কিছু বলুন !"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। তারপর নানারকম বোতাম টিপতে লাগলেন। ধীরে-ধীরে বোর্ডের ওপর একটা ম্যাপ ফুটে উঠল। অর্জুন উত্তেজিতভাবে তাকাল। হ্যাঁ, শহরের ম্যাপ। বাড়ি, রাস্তা। বৃদ্ধ বললেন, "অনেকটাই অনুমান-নির্ভর ম্যাপ। কিছু ছবি আর বইপত্র ঘেঁটে তৈরি। তখন তিস্তা শহরের পাশে ছিল অনেকটা জায়গা নিয়ে। এই যে।"

বৃদ্ধের স্টিক অনুসরণ করে অর্জুন তাকাতে নদীর চিহ্ন দেখতে পেল। তিস্তা যদি ওটা হয়,তা হলে পাশেই সেনপাড়া এবং হাকিমপাড়া। সে জিজ্ঞেস করল, "তিস্তা সেতুটা কোথায়, যার ওপর দিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়া যেত ?"

"সেতু ? শহরের ছবিতে তিস্তার ওপরে কোনও সেতু নেই। রাস্তাগুলো ছিল খুব সরু। কিছু ব্যক্তি চা-ব্যবসার কল্যাণে ধনী ছিলেন, কিন্তু অনেকেই দরিদ্র।"

হঠাৎ অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "ওই তো করলা নদী !"

বৃদ্ধ ফিরে তাকালেন, "হ্যাঁ, তখন ওই নামে একটা খাল ছিল কিন্তু এ-তথ্য আপনি জানলেন কী করে ?"

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হয়নি। বলাকা বলল, "উনি ওই সময় সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন।"

"তাই নাকি ? আমাদের এই ইতিহাস-ঘরের বাইরে তথ্য আছে ? বেশ, তখন অঞ্চলগুলোকে কিভাবে ভাগ করা হত বলুন তো ?"

"পাড়া হিসাবে। আলাদা নাম ছিল পাড়ার। এই যে তিস্তার পাশে আর করলার মধ্যে জায়গাটা, এর নাম ছিল হাকিমপাড়া। এইটে স্টেডিয়াম। আমরা টাউন ক্লাব স্টেডিয়াম হিসাবে জানি।" অর্জুন উজ্জ্বল মুখে বলল।

"আপনি ঠিক বলছেন। এত বিশদ আমিও জানি না।"

"এই ইতিহাস-ঘর ওই ম্যাপের কোনখানে হবে ?"

বৃদ্ধ তাঁর স্টিকটি যেখানে রাখলেন সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আরে, এটা তো জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি। পাশে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরের পাশে বিরাট বিল। দাঁড়ান, এই সোজা চলে এলাম, দিনবাজারের পুল পেরিয়ে সোজা কদমতলার রাস্তায়, হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে এখন কী বলে ?"

"পাতালরেল দফতর।"

অর্জুন হতভম্ব। বাড়িটা যেখানে সেখানে একশো সত্তর বছর বাদে পাতাল রেলের দফতর হবে। রাজবাড়ির চিহ্ন থাকবে না। সে জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলটাকে খুঁজল। শ্যামাপ্রসাদবাবু এখন হেডমাস্টারমশাই। খুব ভাল লোক। সে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, "এইটে একটা বড় স্কুল।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "ওটিকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাশয়, আপনি এত তথ্য জানতে পারলেন কী করে ?"

অর্জুন হাসল, "জেনেছি। আচ্ছা, মোটে তো একশো সত্তর বছর। এমন কোনও প্রবীণ মানুষের কথা কি জানেন, যিনি তাঁর পিতা বা পিতামহের কাছে অতীত দিনের কথা শুনে মনে রেখেছেন ?"

বৃদ্ধ হাসলেন, "আমিই শুনেছি। আমার পূর্বপুরুষের চা-বাগান ছিল। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তার একটু আগে একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন যাকে নাকি জলপাইগুড়ি শহরের পিতা বলা হত।"

অর্জুন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তাঁর নাম কি এস পি রায় ?"

"এস পি ? হ্যাঁ তিনি রায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়।"

আপনি সত্যেন্দ্রপ্রসাদের বংশধর ?" অর্জুন হতভম্ব।

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁকে চেনেন ? বৃদ্ধ এবার বেশ অবাক হলেন। এই সময় বলাকার হাতের ঘড়িতে বিপ্ বিপ্ শব্দ শুরু হল। সে বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার দূরাভাষ আমি ব্যবহার করতে

পারি ?"

"অবশ্যই।" দূরের একটি ডেস্ক দেখিয়ে দিলেন।

বলাকা সেদিকে এগিয়ে গেল। ডেস্কের উলটোদিকে দূরদর্শনের পরদার মতো একটা পরদায় আলো জ্বলে উঠল বলাকা বোতাম টিপতেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, সেই সময় যে-সমস্ত মানুষ বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের নাম জানা যাবে ?"

বৃদ্ধ বললেন, "নিশ্চয়ই। কলকাতার বিখ্যাত মানুষদের সংখ্যা অনেক। সেসব তথ্য পেতে কষ্ট হয়নি। বিভিন্ন জেলার মানুষদেরও আমরা যতটা সম্ভব এই সংগ্রহে রেখেছি।" ভদ্রলোক বোতাম টিপতেই ম্যাপ মুছে গেল। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী ধরনের মানুষের কথা জানতে চান ?"

"ভাল খেলোয়াড় ?"

বোতাম টেপা হল। অর্জুন দেখল দুটো নাম ফুটে উঠেছে। তেরোশো পঞ্চাশের পর দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় হলেন, রুণু গুহঠাকুরতা এবং মণিলাল ঘটক। এঁরা ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

"শিল্পী ?"

বোতাম টেপা হল। না। সেই সময় জলপাইগুড়িতে ভারতবিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না।

হঠাৎ অর্জুনের মাথায় ডক্টর গুপ্তের কথা ভেসে উঠল। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই বিখ্যাত মানুষ। যদিও অনেকেই তখন তাঁর নাম জানত না। কিন্তু শিলিগুড়ির কাছে যেখানে ওঁর গবেষণাগার সেটা জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ে না। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "দার্জিলিং জেলার বিবরণ আছে ?"

বৃদ্ধ তাকে পাশের টেবিলে নিয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তেরোশো আটানব্বই সালে ডক্টর গুপ্ত নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন··· ।"

বৃদ্ধ বোতাম টিপলেন। পরদায় ফুটে উঠল দার্জিলিং জেলার দুশো বছরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী—ডক্টর এস· বি· গুপ্ত এবং তাঁর পরে অনেক নাম।

অর্জুনের মনে পড়ল না, ডক্টর গুপ্তের প্রথম নাম এস বি কি না। তবে এই মানুষটি যে তিনিই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে বলল, "ওই ডক্টর এস বি গুপ্ত সম্পর্কে বেশি কিছু জানলে ভাল লাগবে।"

ডক্টর গুপ্তের নামের পাশের একটা নীল আলো দপদপ করতে লাগল। তারপর পরদায় লেখাগুলো ফুটে উঠল, ডক্টর সুরব্রত গুপ্ত। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে চোদ্দশো সাত সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তেরোশো আটানব্বইতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মস্তিষ্কে

আঘাত লাগে এবং কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকেন। সুস্থ হওয়ার পর দেখা যায় তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন হয়েছেন। চোদ্দশো দশ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর গবেষণার জন্যই এখন সূর্যের সংসারের বাইরে অন্য একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গ্রহটির নামকরণ তাঁর সম্মানে করা হয়েছে সুরব্রত।

অর্জুনের কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তার মানে ডক্টর গুপ্ত মারা যাননি। আরও নয় বছর গবেষণা করার পরে উনি নোবেল পাবেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ খবর তিনি নিজেও জানেন না।

কতক্ষণ এইসব নিয়ে সে মগ্ন ছিল জানে না। চৈতন্য হল যখন সে দেখল, বলাকার সঙ্গে আরও চারজন প্রৌঢ় তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন তাকে বলল, "আপনি অর্জুন ? বেশ। আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।"

"কোথায় ?"

"প্রধান তদন্তকেন্দ্রে।"

"কেন ?"

"আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। তারপরে যদি প্রয়োজন হয় আপনি আইনের সাহায্য নিতে পারেন। আসুন।"

অর্জুন অসহায় হয়ে বলাকার দিকে তাকাল। বলাকা মাথা নিচু করল। অগত্যা প্রৌঢ়দের অনুসরণ না করে উপায় রইল না অর্জুনের।

যেভাবে হাতকড়া না পরিয়ে বন্দিদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় সেইভাবেই ওরা অর্জুনকে নিয়ে চলল শহরের প্রান্তে। রাস্তাঘাট চিনতে পারল না সে। মূল প্রবেশদ্বারে কোনও রক্ষী নেই। ড্রাইভার মাইক্রোফোনে সাঙ্কেতিক শব্দ বলতেই গেট খুলে গেল। গাড়ি চলল সরু পথ দিয়ে। আরও দুটো গেট পার হওয়ার পর সবাই গাড়ি থেকে নামল। বিশেষ একটি ঘরে ওদের সঙ্গে ঢুকে অর্জুন দেখল আরও দু'জন মানুষ যেন সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

একজন প্রশ্ন করল, "ইনিই সেই অবাঞ্ছিত অতিথি ? কী নাম ?"

দাঁড়িয়ে থেকেই অর্জুনকে জবাব দিতে হল, "অর্জুন।"

"আপনি বলেছেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি। কোথায় ?"

"এখন সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনাদের পাতাল রেলের যেখানে দফতর সেখানেই আমাদের বাড়ি ছিল", অর্জুন নির্বিকার মুখে জবাব দিল।

জবাবটা শোনামাত্র সবাই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল। একজন বলল, "আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন, পাতাল রেলের দফতর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তত একশো বছর আগে।"

'আমি আপনাদের সময়ের একশো সত্তর বছর আগে ওখানে

থাকতাম।"

"আপনি যা বলছেন তা আপনার ধারণায় সত্যি ?"

"অবশ্যই।"

"তার মানে আপনি অতীতের মানুষ, এই বর্তমানে কীভাবে এলেন ?"

"ডক্টর গুপ্তর বাংলোয় তাঁর তৈরি মেশিনে চড়ে।"

"ডক্টর গুপ্ত কে ?"

"তিনি একশো সত্তর বছর আগে সময়, মহাকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতেন।"

অর্জুন দেখেনি, ইতিহাসঘরের সেই বৃদ্ধকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। ইঙ্গিতমাত্র তিনি এগিয়ে এসে নিচু গলায় কিছু জানালেন। সম্ভবত একটু আগে ডক্টর গুপ্ত সম্পর্কে জানা কিছু তথ্য। এবার যেন সত্যি অর্জুনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করল এরা। সঙ্গে-সঙ্গে হইচই পড়ে গেল। একজন প্রশ্ন করল, "আপনি তরুণ। ওই সময়ে জলপাইগুড়িতে আপনি কি করতেন ?"

"প্রচলিত অর্থে তেমন কিছু নয়।"

"ডক্টর গুপ্ত একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হল কী করে ?"

"তাঁকে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তিনি গবেষণার কাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমি সেটা সক্ষম হইনি তাঁরই আচরণের জন্য।"

"আপনার সাহায্য তিনি কেন চেয়েছিলেন ?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"এজন্য আপনি শিক্ষা নিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। আমার গুরু অমল সোমের সহকারী হিসাবে আমি অনেকটা শিখেছি।"

"তিনি কি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ?"

"যে-কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসঘরের বৃদ্ধকে নির্দেশ দেওয়া হল, অমল সোম সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। তিনি টেলিফোন-ডেস্কের সামনে গিয়ে বোতাম টিপে সংযোগ করতেই ইতিহাসঘরের সহকারীকে পরদায় দেখা গেল। সেই ভদ্রলোক নির্দেশ শুনে সেটা পালন করতেই টেলিফোনের উলটো দিকের পরদায় ফুটে উঠল, "অমল সোম—বিস্তারিত বিবরণ শূন্য।"

প্রশ্নকারীর একজন হাসল, "কীরকম বিখ্যাত সেটা বুঝতেই পারছি। গুরুর যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন একবার শিষ্যের খোঁজ করুন।"

ইতিহাসঘরের বৃদ্ধ অর্জুনের নাম জানাতেই তাঁর সহকারী পরদায়

ফুটিয়ে তুলল, "অর্জুন, সত্যসন্ধানী, নানান রহস্য উদ্ধার করেছেন। বর্তমান থেকে অতীতে তিনি পরিক্রমা করে এসেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান।"

এবার এই ঘরে কোনও কথা নেই। বৃদ্ধ টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মুখ্য প্রশ্নকর্তা অর্জুনের দিকে এগিয়ে এলেন, "আমি জানি না আপনি খুব বড় প্রতারক কি না। হয়তো এসব তথ্য জেনেই আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে এখানে এসেছেন। আবার এও হতে পারে, আপনি যা বলছেন তা সত্যি। সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন। আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগবে। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আমাদের অতিথি হিসাবে থাকতে হবে।" ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে দু'জন রক্ষী অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যে-ঘরটিতে তাকে নিয়ে আসা হল তার একটিমাত্র জানলা। কিন্তু তার কাচ বন্ধ। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রক্ষীরা চলে গেলে অর্জুন বুঝল তাকে ওরা বন্দি করে রেখে দিল। হয়তো আরও খোঁজখবর করবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেসব জানার পর রায় দেবেন। সেই রায় যদি তার বিপক্ষে যায় তা হলে ? এরা কি তাকে মেরে ফেলবে ? এখানে এখন শাস্তির পরিমাপ কি ? সে তো কোনও অন্যায় করেনি।

সেঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখল। একটি সুন্দর বিছানা, বিছানার পাশেই টেলিফোন-ডেস্ক। দেওয়ালে কিছু বই। সে এগিয়ে গেল। প্রথম বইটি গীতবিতান। অন্য বইগুলো গীতবিতানের গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান যাদের কাছে বেদ অথবা মহাভারতের মতো, তারা কি তার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর হতে পারে ?

অন্যমনস্ক অর্জুন পকেটে হাত ঢোকাতে সিগারেটের প্যাকেটের স্পর্শ পেল। সিগারেট সে খুবই কম খায়। গত আট-দশ ঘণ্টায় তো খায়নি। সে সিগারেট ধরাল। নার্ভে যে অবস্থা তাতে সিগারেট সাহায্য করবে হয়তো। অর্জুন ধোঁয়া ছাড়তেই অদ্ভুত কাণ্ড হল। ঘরের ভেতর দপ করে আলো জ্বলে উঠে সোঁ-সোঁ শব্দ শুরু হল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল এবং বেশ কিছু উত্তেজিত মুখকে উঁকি মারতে দেখা গেল। অর্জুন হতভম্ব। লোকগুলো তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। দরজা খোলা থাকায় কানে আসছে সাইরেন জাতীয় কিছু একটা তীব্রস্বরে বাজছে। এই সময় একজন কর্তাব্যক্তি ছুটে এলেন, "আপনি ওটা কী করছেন ?"

"আমি ? সিগারেট খাচ্ছিলাম।"

"সিগারেট ? ওর ভেতর কী আছে ?"

"তামাক। সাধারণ তামাক।"

"নিভিয়ে ফেলুন। চটপট। তামাক পোড়ার ধোঁয়া মানুষের স্বাস্থ্যের শত্রু। আপনি নিজে মরবেন, আমাদেরও মারবেন।"

"এখানে কেউ তামাক খায় না? সিগারেট বিক্রি হয় না?"

"ওসব এখানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ ওসব খাচ্ছে জানলে তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হয়। নিভিয়ে ফেলুন বলছি।"

অর্জুন সিগারেট নেভাল। ওরা এবার একটা যন্ত্র নিয়ে এসে ঘরে যেটুকু ধোঁয়া ছিল সব টেনে নিল। তারপর একটা পাত্রের ভেতর সিগারেট, দেশলাই ফেলে দিতে বলল অর্জুনকে। হুকুম পালন না করে কোনও উপায় ছিল না। ওরা দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল একজন চিকিৎসক আসবেন ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। অর্জুন খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসল।

সিগারেট খাওয়া নিয়ে এমন কাণ্ড হবে কে জানত! উনিশশো একানব্বইতে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সতর্কীকরণ লিখে ছেড়ে দেওয়া হত। দেশের ভেতর প্লেনে চাপলে সিগারেট খাওয়া যেত না, হাসপাতালে নয়, ট্রাম-বাস অথবা সিনেমা হলে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এমন আতঙ্ক তখন সৃষ্টি হয়নি। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, সেই সময় যদি এটা না হত তা হলে মানুষের উপকারে লাগত।

কী আশ্চর্য! এর মধ্যেই সে সেই সময় বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাও করা যায় না। এখন যদি সে ওখানে থেকে যায় তা হলে তার বয়স একশো সত্তর বছর বেশি হয়ে যাবে? অসম্ভব। অর্জুন নিজের গালে হাত বোলালো। গতকাল সকালে সে দাড়ি কেটেছে। কোথাও যাওয়ার না থাকলে সে একদিন অন্তর দাড়ি কাটে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা বাদে যতটুকু দাড়ি সাধারণত বাড়ে তার অর্ধেকও বাড়েনি। কেন এমন হল? তার কি এখানে থাকার সময় বয়স বাড়ছে না? সে যদি দশ বছর এখানে থাকে তা হলেও বয়স বাড়বে না?

এই সময় দরজায় শব্দ হল। সেটা খুলে যেতে দু'জন মানুষ কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাদের আপাদমস্তক মহাকাশচারীদের মতো পোশাকে ঢাকা। একজন বললেন, "আমরা চিকিৎসক। আপনার শরীর পরীক্ষা করব। দয়া করে উঠে আসুন।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "এমন অদ্ভুত পোশাক আপনারা পরেছেন কেন?"

"সংক্রামিত হতে পারে এমন রোগ থেকে সতর্ক থাকতে চাই।"

"কিন্তু আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ।"

"আপনি ধূমপান করেন। এটা জানার পর এই সতর্কতার প্রয়োজন হয়েছে।"

অর্জুনের সমস্ত শরীর রশ্মিযন্ত্র দিয়ে পরদায় ফুটিয়ে তুলে বিশ্লেষণ করা হল। তার রক্তচাপ, হৃদযন্ত্র, রক্তের ঘনত্ব ইত্যাদি পরীক্ষা করার পর

চিকিৎসক বললেন, "এখনও আপনার ফুসফুস নিকোটিনের কবলে পড়েনি। কিন্তু আপনি যদি আর কিছুদিন ধূমপান করেন তা হলে সেই আশঙ্কা থাকছে।"

ওরা আবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল। এবার চেয়ারে বসে অর্জুনের মনে হল, অনেক হয়েছে, এবার ফেরার কথা ভাবা দরকার। সে চিরকাল এখানে পড়ে থাকতে পারে না। বাড়িতে মা আছেন। তা ছাড়া, এদের রেকর্ড যদি ঠিক কথা বলে তা হলে সে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবে। তাকে মরতে হবে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে। অর্জুনের এখনই শিরশির করল শরীর, যদিও পঞ্চাশে পৌঁছতে তার ঢের দেরি আছে। কিন্তু তাকে ফিরে যেতে হলে সেই হাইওয়ের পাশের জঙ্গলে যেতে হবে। এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যেতে এরা নিশ্চয়ই দেবে না। অর্জুনের মনে হল, এখানকার মানুষজন একটু আলাদা ধরনের। আবেগ কম, কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব।

তবে হ্যাঁ, এখানে এসে তার কয়েকটা লাভ হয়েছে। প্রথমত, ডক্টর গুপ্ত তাঁর গবেষণা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন এই তথ্য জানা গেল। ভদ্রলোক নোবেল পুরস্কার পাবেন। দ্বিতীয়ত, সে নিজে পঞ্চাশ বছরের আগে মারা যাবে না। তৃতীয়ত, একশো সত্তর বছর পরে জলপাইগুড়ির কী অবস্থা হবে সেটাও নিজের চোখে দেখা গেল।

চুপচাপ কতক্ষণ কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মিষ্টি বাজনার আওয়াজ কানে আসতেই সে সোজা হল। ঘরের এককোণে টেলিফোন-ডেস্কে আলো ফুটে উঠেছে। অর্জুন পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। যেভাবে এর আগে কথা বলার সময় অন্যদের বোতাম টিপতে দেখেছে সেইভাবে সে একমাত্র বোতামটি টিপতেই পরদায় একটি পুরুষের ছবি ভেসে উঠল। ভদ্রলোক বললেন, "শুভসন্ধ্যা। তথ্য ও জনকল্যাণ দফতর থেকে বলছি। আজ দুপুরে আমাদের আপনার কথা জানানো হয়েছে। দেশবাসী আপনার সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"করুন। কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"আচ্ছা। এখনই সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আপনি···।"

"দাঁড়ান। এখানে আসার পর আমি স্যুপ আর সবজিসেদ্ধ খেয়েছি। আসলে ওতে আমার মন ভরে না, খিদেও মেটে না।"

"আপনি কী ধরনের খাবার খেতে চাইছেন?"

"একদম দিশি। ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ কিংবা মাংসের ঝোল। অবশ্য এখন যদি সন্ধেবেলা হয়, আপনি শুভসন্ধ্যা বললেন বলেই বলছি, পরোটা আর কাবাব পেলেও চলবে। সঙ্গে এক কাপ ভাল চা।"

"এক মিনিট দাঁড়ান।" ভদ্রলোক সময় চেয়ে নিয়ে কাউকে ইঙ্গিত

করলেন দেখা গেল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ, আপনি অর্জুন। একশো সত্তর বছর আগে এই শহরে বসে সত্যসন্ধান করতেন। হঠাৎ ভবিষ্যতে এসে আপনার কেমন লাগছে? কী-কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?"

"সব কিছুই পরিবর্তিত। এসব আমরা ভাবতে পারতাম না।"

"তখনকার জীবন আর এখনকার জীবনের মধ্যে কোনটা ভাল?"

"জীবনযাপনের সুবিধেগুলো এখানে বেশি।"

"আমাদের পূর্বপুরুষ ডক্টর গুপ্তর মহাকাশ এবং সময়সম্পর্কিত অবিষ্কার এখনকার বৈজ্ঞানিকদের খুব সাহায্য করছে। আমরা এখন স্বচ্ছন্দে সময়কে নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য গ্রহে যেতে পারি। ডক্টর গুপ্তকে আপনি দেখেছেন। একজন মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন?"

"আমি তাঁকে মাত্র একটি সন্ধে দেখেছি। সেই সময় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন, কারণ, তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাঁর গবেষণা নষ্ট করে দিতে পারে।"

"কারা?"

"আমি জানি না।"

"ওহো, এইমাত্র আমাদের খাদ্য দফতর জানিয়েছে, আপনি যেসব খাবার খেতে চেয়েছেন তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। ভাত-ডাল-তরকারি বা মাছের ঝোলে শুধু উদর ভর্তি হয় কিন্তু কর্মক্ষমতা বাড়ে না। আর পরোটা, কাবাব সুপাচ্য নয়, আপনার পেটের পক্ষে ক্ষতিকর। আসলে এই অনাবশ্যক খাবারগুলো অনেকদিন হল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সেইসব খাবার খাওয়া উচিত যা তার শরীরকে পরিপূর্ণ করবে। আপনি মুরগির মাংস সেঁকা অবস্থায় খেতে পারেন এবং তাই আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে ভাল দুধ।" ভদ্রলোক হাসলেন।

অর্জুন বিমর্ষ হল, "এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।"

"আপনি কি কিছু বলছেন?" ভদ্রলোক যেন ঠিক বুঝতে পারেননি।"

"আমি যা বলছি তা আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"কেন?"

"যে পায়েস, মালপোয়া বা গোকুল পিঠে খায়নি সে শীতকালের খাবার কত ভাল হতে পারে জানবে কী করে?"

ভদ্রলোক গম্ভীর হলেন, "হ্যাঁ, এবার আপনার সঙ্গে একটি পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেব। সারা দুপুর সন্ধানকাজ চালিয়ে এঁদের আমরা আবিষ্কার করেছি। চেয়ে দেখুন, একেবারে বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তাঁর নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পাশে তাঁর স্ত্রী লাবণ্য। লাবণ্যের পাশে ওঁদের ছেলে ক্ষেমঙ্কর এবং পুত্রবধূ মালিনী।"

অর্জুন দেখল পরিবারের চারজনই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে ছিল, এবার

নমস্কার করল। তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "এই পরিবার আপনার উত্তরপুরুষ। আপনার রক্ত এঁদের দু'জনের শরীরে বর্তমান।"

অর্জুন হতভম্ব। বৃদ্ধ, যাঁর নাম মধুসূদন বেশ উত্তেজিত এখন, "আপনি, আপনি আমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ ? এভাবে আপনার দর্শন পাব আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।"

"আপনি, আপনি আমার উত্তরপুরুষ ?" কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না। আমি কত ছোট।"

"কিন্তু কী করে নিশ্চিন্ত হলেন ?"

"মানে ? আমার প্রপিতামহের ডায়েরি আমার কাছে আছে। তাতে তিনি তাঁর আটজন পূর্বপুরুষের নাম লিখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সম্পর্কে বিশদ লেখা আছে। আপনি সত্যসন্ধানী ছিলেন। দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আপনার দুই পুত্র-সন্তান। একজন সন্ন্যাসী হয়ে যান। দ্বিতীয়জনের বংশধর আমরা। আপনার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এসব আমি জানি। গল্প পড়ার কৌতূহলে পড়েছি। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে আমরা তা ভাবিনি। এই হল আমার পুত্র ক্ষেমঙ্কর। ওকে আশীর্বাদ করুন।" বৃদ্ধ মধুসূদন হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিতে সে আশীর্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। অর্জুনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। যে-বংশধরদের মানুষ কখনওই দ্যাখে না তাদের সামনে অনেক কমবয়স্ক শরীর নিয়ে সে বসে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম মধুসূদন, কিন্তু ওঁর ক্ষেমঙ্কর, কেন ?"

"আসলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রাবলী থেকে নামকরণ করা এখন নিয়ম।"

"কিন্তু ক্ষেমঙ্করের স্ত্রী তো মালিনী ছিলেন না ?"

এবার সুন্দরী মহিলা যাঁর নাম মালিনী, জবাব দিলেন, "না, ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, মালিনী ক্ষেমঙ্করকেই ভালবাসত।"

নাটকটি দেখেছে অর্জুন। কিন্তু এমন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ল না। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে মালিনী বললেন, "একেবারে শেষে মালিনী বলেছেন, মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমঙ্করে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পতন এবং মূর্ছা। ওটা হয়েছিল ভালবাসার কারণেই।"

এবার লাবণ্য জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাদের বাড়িতে আসবেন ?"

"আমি কোথায় যেতে পারি তা জানি না। এঁরা আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছেন।"

তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, "আপনার মঙ্গলের জন্যই তা করা

হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যদি জানে আপনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ তা হলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। সেটা আমরা চাই না।"

"বিপদে কেন পড়ব ?"

"ইতিহাস বলে বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ ছিল। তারা অকারণে বিশ্বজুড়ে দু-দু'বার মারাত্মক যুদ্ধ করেছে। সেই যুদ্ধে নৃশংসভাবে তারা শত্রুপক্ষের মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।"

"সেটা জার্মানি, ব্রিটেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ কখনওই সেটাকে মেনে নিতে পারেনি।"

"দেখুন, আপনাদের ইতিহাসে সবসময় রাষ্ট্রনায়কদের কথাই লেখা থাকত, সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা হত। যা হোক, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হল। এবার আপনি বিশ্রাম করুন।"

চট করে আলো নিভে গেল। অর্জুন সুইচ অফ করতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন মানুষ একটা ট্রলিতে করে খাবারের ডিশ, গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। কোনও কথা না বলে তারা আবার বেরিয়ে গেল। অর্জুন দেখল এক প্লেট রোস্টেড মুরগি আর একগ্লাস দুধ রয়েছে ট্রলির ওপরে। মুরগির মাংসের পরিমাণ প্রচুর। একটুও সময় নষ্ট না করে সে খাবারে মন দিল। নরম মাংস, কিন্তু লবণের পরিমাণ খুব কম। এরা নুনও কম খায় বোধ হয়। পেট ভরে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়ে গেল সে। তারপর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। যেখানে যাই হোক, এখন তার শরীর একটু ঘুম চাইছে।

অথচ ঘুম এল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকে নাতি কিংবা পুতির মুখ দেখে, ও দেখল কয়েক প্রজন্মের পরের মানুষগুলোকে। দেখে অবাক হয়েছিল কিন্তু কোনওরকম টান যা স্নেহ-ভালবাসা থেকে তৈরি হয় তা মনে আসেনি। ওদের কেমন বানানো-সাজানো মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এরা তাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায় ভেবে পাচ্ছিল না অর্জুন। কিন্তু আর নয়, এবার তার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। সে এখন ঠিক কোথায় আছে তা জানা নেই। হাইওয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ডক্টর গুপ্তের মেশিনটাকে সে লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওই মেশিনটার সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে ফেরা অসম্ভব। যেমন করেই হোক, মেশিনটার কাছে সবার অলক্ষ্যে তাকে পৌঁছতেই হবে।

অর্জুন উঠে বসল। তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কী করে সেই জায়গাটায় যাওয়া যায় ? বলাকা যখন তাকে গাড়িতে নিয়ে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল তখন তো কোনও জঙ্গল চোখে পড়েনি। অথচ সেই জঙ্গল থেকে হাঁটা শুরু করেই সে বলাকাদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। অতএব, সেই নির্দিষ্ট হাইওয়েতে যেতে হলে

বলাকাদের বাড়ির দিকে যেতে হবে। অর্জুনের মনে পড়ল, দুপুরের পর থেকে বলাকার দেখা সে পাচ্ছে না।

কিন্তু কী করে সেই জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে ? প্রথম কথা, তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বাড়ির অন্য দরজাগুলোয় নিশ্চয়ই ভাল পাহারা আছে। এখানে কোনও ট্রাম-বাস চোখে পড়েনি। হয়তো পাতাল রেল সেই জায়গাটার কাছাকাছি যায়। কিন্তু কীভাবে যেতে হয় তা সে জানে না। খুবই অসহায় হয়ে পড়ল অর্জুন।

ঘুমিয়ে পড়েছিল অর্জুন। সেটা কতক্ষণ তা বোঝার উপায় নেই। কারণ, সে আবিষ্কার করল ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে আছে। কী করে একটা অটোমেটিক ঘড়ি হাতে পরে থেকেও বন্ধ হয়ে যায় কে জানে !

অর্জুনের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। ঘরের ওপাশে একটা দরজা আছে, ঢোকার পরেই চোখে পড়েছিল। সে বিছানা ছেড়ে সেই দরজায় চাপ দিতে একটা মাঝারি ঘর দেখতে পেল। হালকা আলো জ্বলছে। ঝকঝকে তকতকে আধুনিক টয়লেট। লোকগুলোর তা হলে রুচি আছে।

শরীর হালকা হওয়ার পর সে জানলাটার দিকে তাকাল। কাচের জানলা। ভেতর থেকেই বন্ধ। সে একটু চেষ্টা করতেই জানলাটা খুলে গেল। চোখের সামনে নীল আকাশ। অনেক তারার ভিড় সেখানে। তার মানে এখন রাত অনেক। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে রয়েছে বেশ কয়েক তলা ওপরে। এই জানলা দিয়ে নীচের দিকটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না। জানলার গরাদ ভেঙে পালাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। অত ওপর থেকে পড়লে আর দেখতে হবে না।

ফিরে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ খেয়াল হল, তার মৃত্যু হবে পঞ্চাশ বছর বয়সে। পঞ্চাশ হতে তো বহুত-বহুত দেরি। অতএব ওই জানলা দিয়ে বেরোতে গিয়ে পড়ে গেলেও তার বেঁচে থাকার কথা। কিন্তু মরবে না এ-কথা বলা হয়েছে, হাত-পা ভেঙে জবুথবু হয়ে বেঁচে থাকবে না এমন কথা তো ওরা বলেনি।

তবু মারা যাবে না যখন, তখন একবার চেষ্টা করা উচিত। অর্জুন টয়লেটে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জনলার গরাদে হাত দিল। অসম্ভব। সমস্ত জানলাটাই ইস্পাতের মোটা জালে মোড়া। তার একার চেষ্টায় সামান্য নড়ানোও সম্ভব নয়।

অর্জুন ফিরে এসে ঘরে একটা পাক খেল। তারপর সদর দরজায় ধাক্কা মারল। তৃতীয়বারের পর সেই দরজাটা খুলল। যে-লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে রক্ষী ছাড়া কেউ নয়। অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে

এখানে কতক্ষণ বন্দি থাকতে হবে ?"

রক্ষী গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "ওসব বিষয় আমার জানার কথা নয়। আপনি আগামীকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"এখন ক'টা বাজে ?"

"রাতের তৃতীয় প্রহর সবে শেষ হল।" কথাটা বলেই রক্ষী দরজা বন্ধ করে দিল। ঠোঁট কামড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে প্রহরের হিসাব করছিল অর্জুন। তুলসীদাসের গান আছে। 'প্রথম প্রহরে সবাই জাগে, দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী, তৃতীয় প্রহরে তস্কর জাগে, চতুর্থ প্রহরে যোগী।' তার মানে তিন ঘণ্টায় এক প্রহর হলে তৃতীয় প্রহর শেষ হচ্ছে নয় ঘণ্টায়। সন্ধে ছ'টা থেকে নয় ঘণ্টা মানে এখন সবে তিনটে বেজেছে। সে ঘড়ির কাঁটা তিনটেতে নিয়ে গেলেও সেটা চালু হল না। হঠাৎ খেয়াল হতে সে দিন এবং বছরের কাঁটা ঘুরিয়ে একশো সত্তর বছর এগিয়ে নিয়ে আসা মাত্র আশ্চর্যজনকভাবে ঘড়ি চালু হল। অর্থাৎ, ঘড়িও ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চায় ?

হঠাৎ কানে একটা শব্দ হল। কোনও কিছু যেন ঘষটে গেল। অর্জুন চারপাশে তাকাল। সবই তো স্বাভাবিক। সে বাথরুমের দরজায় এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল গরাদের ইস্পাত অদ্ভুতভাবে বেঁকে গিয়েছে। একটু আগেও ওরকম ছিল না। এখন অন্তত এক ফুট ফাঁক হয়ে গিয়েছে। কীভাবে হল ? অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল। এখনই কেউ এমন কর্ম করেছে। কে করল ! এই সময় তার কানে মৃদু স্বরে একটা ডাক পৌঁছল। খুব মৃদু। কিন্তু ডাকটা যে কুকুরের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে আসার পর সে কোনও জীবজন্তু দেখতে পেয়েছে কি না খেয়াল করতে পারল না। এত ওপরে কুকুরের ডাক ? ওরা কি তার ওপর নজর রাখার জন্য কুকুর রেখেছে ? অর্জুন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ফিরে বিছানায় বসতে যেতে খুব কাছ থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ভাল করে তাকাতেই চক্ষুস্থির। এ তো তাতান ! ডক্টর গুপ্তের সেই ছোট হয়ে যাওয়া কুকুর, যার সন্ধানে অন্য গ্রহ থেকে উপদ্রব আসত !

সেই ছোট্ট কুকুর সমানে ডেকে যাচ্ছে। অর্জুন অনেকটা ঝুঁকে আদুরে গলায় ডাকল, "তাতান। তা-তান।" সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা ডাক থামিয়ে কুঁই-কুঁই শব্দ করতে লাগল লেজ নাচিয়ে। অর্জুন ওকে হাতে তুলে নিল, "তাতান, তুই এখনও বেঁচে আছিস ? অদ্ভুত ব্যাপার। তুই এখানে এলি কী করে ?"

তাতান পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সামনের পাদুটো তুলে লাফাবার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছিল অনেককাল পরে সে একটা চেনা মানুষকে দেখতে পেয়েছে। অর্জুন কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছিল না। সে যখন মেশিনে উঠে বসেছিল তখন তাতান ছিল বাক্সে। সময়যন্ত্রের মাধ্যমে এতদূর আসা

ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া ওই ছোট্ট কুকুর এত ওপরে উঠে এসে ইস্পাত বাঁকাতেও পারবে না।

অর্জুন তাতানের গলায় আঙুল বুলিয়ে আদর করল, "তাতান, আমি এখন বন্দি। কীভাবে ফিরে যাব জানি না। তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে।"

হঠাৎই খাটের খানিকটা দূরে রাখা চেয়ারটা ঘষটে একটু এগিয়ে এসে দুলতে লাগল। অর্জুন হতভম্ব। এরকম ভৌতিক ব্যাপার দেখে অন্য সময় কী করত সে জানে না কিন্তু তাতান সঙ্গে থাকায় সে শক্ত হয়ে তাকাল। তার মনে পড়ল ডক্টর গুপ্তের গাড়িটার কথা। ডক্টর গুপ্ত যাকে উপদ্রব বলতেন সেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণীটি এসে গাড়ির ডিকি খুলে কত না ভৌতিক কাণ্ড করেছিল সেই বিকেলে।

এখানেও তেমনই কিছু ঘটছে? অর্জুন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। চেয়ারটা চুপচাপ এখন। তাতান তার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্জুনের মনে হল সেই 'উপদ্রব'টি নিশ্চয়ই তাতানকে নিয়ে এসেছে, নইলে এর এখানে আসার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তাতান একশো সত্তর বছর পরেও বেঁচে আছে?

অর্জুন চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপনি তাতানের বন্ধু। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?"

কোনও জবাব এল না। শুধু চেয়ারটা সামান্য সরে গেল। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি আমার ভাষা বুঝতে পারছেন না?"

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এবার তাতানকে দেখা গেল উত্তেজিত হয়ে বিছানার ধারে চেয়ারের দিকে ছুটে যেতে। একেবারে কিনারে পৌঁছে চেয়ারের দিকে মুখ করে সে সমানে চিৎকার করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ারটা সরে এল বিছানার পাশে। তাতানের গলা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছিল এবার। রাগী কুকুরকে আদর করলে এমন শব্দ বের করে তারা। অর্থাৎ ওই আদরে তাতান খুশি হচ্ছে না।

ঘরের ভেতর এখন তিনটি প্রাণী, যার একজন অদৃশ্য। অর্জুন ঝুঁকে তাতানের গায়ে হাত রাখতেই মনে হল কিছু যেন চট করে সরে গেল হাতের তলা থেকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর অনুভূতি হল সেই মুহূর্তে। অর্জুন তাতানকে কোলে তুলে নিল, "তাতান, তোমার বন্ধুকে বল আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমি সাহায্য চাই।"

কুকুরের কাছে প্রশ্নের জবাব চায়নি অর্জুন, যার কাছে চেয়েছিল সে রইল চুপচাপ। অর্জুন মরিয়া হল, "যদি আমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে থাকে তা হলে ওই চেয়ারটাকে খাটের নীচের দিকে সরিয়ে দেওয়া হোক।"

প্রায় দশ সেকেন্ড কিছুই হল না, তারপর সবিস্ময়ে অর্জুন দেখল চেয়ারটা সরে গেল খাটের একপাশে। আর তারপরেই বাথরুমের জানলায় মটমট করে শব্দ হতে লাগল। শব্দ থেমে যাওয়ার পর অর্জুন এগিয়ে গেল তাতানকে খাটের ওপর রেখে বাথরুমের ভেতর। গিয়ে সে দেখল জানলার অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে জানলা দিয়ে বাইরে বেরোতে পারে। অর্জুন ঘরের দরজায় ফিরে অবাক, তাতান নেই। কিন্তু তার ডাকটা কানে আসছে জানলার দিক থেকে। অর্থাৎ তাতানকে আড়ালে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে 'উপদ্রব'টি। অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে আর ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীকে উপদ্রব বলাটা ঠিক হবে না। সে দু' হাতে ভর রেখে জানলায় উঠে শরীরটাকে গরাদের বাইরে নিয়ে এল। অনেক নীচে রাত্রের রাজপথ। সেখানে কোনও মানুষ অথবা যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হল। এত ওপর থেকে সে নীচে নামবে কী করে ?

অর্জুন পাশের দেওয়ালগুলো দেখল। না, জলের পাইপ বা ওই জাতীয় কোনও বস্তু নেই যা বেয়ে নীচে নামা যায়, কার্নিসে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবছে যখন, তখনই একটা বড় ধাক্কা খেল সে। ধাক্কা এমন আচমকা ছিল যে, তার পদস্খলন হল এবং প্রায় ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে হু-হু করে নামতে লাগল। অর্জুন বাঁচার জন্য মরিয়া হল। কোনওরকমে মাথাটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারল সে। কিন্তু যে গতিতে সে নামছে তাতে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেতে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না। মাটির কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছে তখন দুই কাঁধ এবং কোমরে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা টান অনুভব করল সে। শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি লাগল, কিন্তু নিজের শরীরটাকে ধীরে-ধীরে ফুটপাথে নেমে আসতে দেখল সে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কোমর, কাঁধ টনটন করছে। অত ওপর থেকে পড়ার পরেও বেঁচে থাকার বিস্ময়টা সেইসঙ্গে প্রবল, সে এখন বুঝে গিয়েছে ডক্টর গুপ্তের সেই উপদ্রবটি এবার তাকে বাঁচাল। কিন্তু তারা ধারেকাছে নেই বা থাকলেও সে দেখতে পাচ্ছে না।

অর্জুন ভেবেছিল পা বাড়ালেই পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। এক পা এক পা করে সে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়াল। পেছনের ঘরবাড়িগুলো এখন অন্ধকার, দরজা বন্ধ। এখান থেকে কিভাবে হাইওয়ের ধারের জঙ্গলে পৌঁছনো যায় ? সে হাঁটা শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে, রাস্তাঘাট কি, তা সে জানে না। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা চিহ্ন, তার নীচে লেখা, পাতাল রেল। পাশ দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি।

সেখানে পা দিয়ে ও জলপাইগুড়ির ম্যাপ দেখতে পেল। একটু খুঁটিয়ে দেখে সে স্টেডিয়ামটাকে চিনতে পারল, ওইখানে বলাকা তাকে নিয়ে

গিয়েছিল। বলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় 'সুস্বাগতম' লেখা দেখতে পেয়েছিল। তার মানে বলাকার বাড়ি শহরের বাইরে, স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর আন্দাজে মনে হল জায়গাটাকে সে চিনতে পারছে। বলাকাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যে হাইওয়ে চলে গিয়েছে, সেইখানে তাকে যেতে হবে। মূল শহরের ম্যাপের পাশে পাতাল রেলের ম্যাপ। অর্জুন দেখল সেদিকটায় পাতাল রেলের একটা লাইন শেষ হয়েছে। লাইনের নাম, মুক্তধারা। এদের পাতাল রেলের বিভিন্ন লাইনের নামকরণ হয়েছে কবিগুরুর নাটক থেকে।

কিন্তু পাতাল রেলে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। অভিজ্ঞতা আছে তার। টিকিট যন্ত্রের ভেতর না ঢোকালে দরজা খোলে না। টিকিট কেনার পয়সা তার নেই। একশো সত্তর বছর আগেকার নোট যে এখন বাতিল হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। মুহূর্তেই কর্তৃপক্ষ তার অস্তিত্ব জেনে যাবে। এখন কি পাতাল রেল চলছে? অর্জুন ইতস্তত করছিল এমন সময় একটা লোককে অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার রকমসকম খুব চেনা। হিন্দি সিনেমায় যে গুন্ডাদের দেখা যায় এর ভাবভঙ্গি তাদের মতন।

লোকটা ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল, "বাঁচতে চাও তো পকেটে যা আছে দাও।"

অর্জুন এমন অবাক যে, না বলে পারল না, "এখানে এখনও গুন্ডামি হয়?"

"আবার বাজে কথা! দাও?" রীতিমত ধমকে উঠল লোকটি।

অর্জুন বিনা বাক্যব্যয়ে পকেটের সব টাকা লোকটার হাতে দিয়ে দিল। আধা-অন্ধকারে লোকটা বলল, "এসব কী হাবিজাবি দিচ্ছ? তোমার ক্রয়পত্র নেই?"

"না।" অর্জুনের মনে পড়ল বলাকা একটা কার্ড নিয়ে ঘোরে।

"এগুলো কী?"

"টাকা।"

"দুস।" লোকটা খুব বিরক্ত হয়ে টাকাগুলো ফেরত দিয়ে বলল, "কপালটাই খারাপ। তা ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছ, পাতাল রেলে চড়বে কী করে বুদ্ধুরাম?"

"সে-কথাই ভাবছি।"

"বুঝেছি, তুমি আমারই মতন শিকার খুঁজছ। নাম কী?"

"অর্জুন।"

"আমি রঘুপতি, তোমার দলে কেউ আছে?"

"না, আমি একা।"

"আমিও। এখনও ধরা পড়িনি। তুমি পড়েছ?"

"না।"

"বেশ ভাল হল। কোথায় যাবে ?"

"মুক্তধারার শেষ প্রান্তে।"

"আরে, ওখানেই তো আমার বাড়ি। তোমাকে আগে দেখিনি কেন ? চলো, আজ রাত্রে আর কিছু হবে না। তবে ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে এলে কী করে ?" লোকটা হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল।

"এসে গেলাম।" অর্জুন সমানে তাল দিচ্ছিল।

"উচিত হয়নি। পাতাল রেলকে ঠকানো উচিত নয়। এবার আমি তোমার প্রবেশপত্র কিনে নিচ্ছি।" লোকটা এগিয়ে গেল একটা মেশিনের দিকে। ওরা তখন পাতাল রেলের মূল দ্বারে পৌঁছে গিয়েছে। অর্জুন দেখল, মেশিনে কার্ড পাঞ্চ করে লোকটা দুটো টিকিট বের করে নিল। সেই টিকিট গেটের গর্তে ঢুকিয়ে ওরা প্ল্যাটফর্মে চলে এল। এখন প্রায় ভোর পাঁচটা। মাটির নীচে পাশাপাশি আটটি প্ল্যাটফর্ম এই ভোরে দু-তিনজন যাত্রী দাঁড়িয়ে। রঘুপতি বলল, "এখানে কিছু করবে না। চারধারে জাল পাতা আছে।"

ঠিক পাঁচটা দশে ওরা ট্রেনে উঠল। ট্রেনের ভেতরটা রবীন্দ্রনাথের নানা লাইন ছবির মতো লেখা। কিছু চরিত্রের ছবিও আছে।

অর্জুন ছুটন্ত ট্রেনে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করো ?"

"মাংস বিক্রি করতাম। পাঁচ মাস আগে ওরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।"

"কেন ?"

"মাংসটা ভাল ছিল না।"

"এখন চলে কী করে ?"

"বেকার ভাতা দেয়। তাতে চলে নাকি ? তাই সপ্তাহে একদিন বেরিয়ে এসে এই কাণ্ড করি। ক্রয়পত্র হাতিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাই দিয়ে জিনিসপত্র কিনে সেটাকে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। তুমি কী করো ?"

"সত্যসন্ধান।"

"সেটা কী জিনিস ?"

"তুমি বুঝবে না। ধরা পড়লে কী হবে তোমার ?"

"কুড়ি বছর। তোমার ?"

"আজীবন।" অর্জুন হাসল।

"তা হলে তো তুমি আমার চেয়েও বড় কিছু করো ?"

এক-একটা স্টেশনে পাতাল রেল দাঁড়াচ্ছিল আর যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল। তারা উঠে অর্জুনের দিকে তাকাচ্ছিল বারেবারে। কিন্তু সে একজন সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে দেখে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল।

রঘুপতি হাসল, "এই পোশাক কোথায় পেলে ?"

"পেয়ে গেলাম।"

"খুব মজাদার পোশাক।"

মুক্তধারার শেষ প্রান্তে ওরা ট্রেন থেকে নামল। গেট থেকে বাইরে পা দিতেই আকাশবাণী হল, "জলপাইগুড়ি শহরের অধিবাসীদের জানানো হচ্ছে গতকাল অতীত-থেকে-আসা একটি মানুষকে গ্রেফতারের পর যখন পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল তখন সে বিভ্রম তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছে। তার পোশাক মজাদার কিন্তু সে অতীব বুদ্ধিমান। ইস্পাতের গরাদ ভেঙে বহুতল বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েও সে জীবিত অবস্থায় এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ওই ব্যক্তিকে দেখামাত্র কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে পুরস্কৃত করা হবে।"

রঘুপতি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঘোষণাটা শুনতে। স্টেশনের মাইকে ঘোষণাটা শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ রঘুপতি সাঁ করে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই কেউ তাকে নির্দেশ দিল আঘাত করো। অর্জুনের হাত এবং পা একই সঙ্গে রঘুপতির শরীরে আঘাত করতেই সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। কে দেখছে না দেখছে লক্ষ্য না করে অর্জুন দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

এদিকের রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং বাড়িঘরের সংখ্যা কম। এখন ভোর বলেই সম্ভবত রাস্তায় মানুষ নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল একজন বৃদ্ধা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন। গাড়িতে কোনও ড্রাইভার নেই। সম্ভবত বৃদ্ধাই চালাবেন। অর্জুন একেবারে বৃদ্ধার সামনে পৌঁছে গেলে তিনি মুখ ফেরালেন। ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড স্থূলকায়। কিন্তু হাসিখুশি।

তিনি অর্জুনকে বললেন, "সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" অর্জুন চটপট জবাব দিল।

বৃদ্ধা এবার ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলতে গেলেন। চাবি নয়, দরজার গায়ের চাকতির নম্বর ঠিক জায়গায় নিয়ে এলে দরজা খুলে যাবে। বৃদ্ধা সেটা মন দিয়ে করার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেল। অর্জুন সেটা কুড়িয়ে ফেরত দিতে বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন, "অনেক ধন্যবাদ। আজ-কাল করে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না। আপনি খুব ভাল মানুষ। বাতের ব্যথার জন্য ঝুঁকে কিছু কুড়োতে আমার কষ্ট হয়।"

অর্জুন বলল, "আমাকে আপনি বলবেন না, আমি অনেক ছোট।"

"বাঃ। এরকম কথা তো এখনকার যুবকদের মুখে শুনি না।" বৃদ্ধা গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ বসলেন, "তুমি এদিকে থাকো?"

"না। হাইওয়ের ওপাশে থাকি।"

"হাইওয়ের ওপাশে? সে তো অনেকদূর। এলে কী করে?"

"আমার এক বন্ধুর গাড়িতে। এখন ফিরব কী করে তাই ভাবছি।"

"আহা। এসো, এসো, আমার যদিও অতদূরে যাওয়ার কথা ছিল না,

তবু চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছি। কি নাম তোমার ?"

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সে জবাব দিল, "অর্জুন।"

"চমৎকার নাম। আমার মেয়ের নাম চিত্রাঙ্গদা।" বৃদ্ধা গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন লক্ষ করল, এই গাড়িটা বলাকার গাড়ির মতনই, তবে ড্যাশবোর্ডে সেই টিভির পরদাটা নেই। শান্ত সকালে গাড়ি ধীরে-ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে আসছিল। অর্জুনের চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সাদা ইউনিফর্ম-পরা পুলিশেরা দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধাও সেটা দেখলেন। নিজের মনেই বললেন, "হঠাৎ এত রক্ষী কেন ? আমার বাপু ওদের ভাল লাগে না।"

অর্জুন সিঁটিয়ে ছিল। তার মনে হচ্ছিল, এত পুলিশ রাস্তায় শুধু তাকেই খুঁজে বের করার জন্য। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন বৃদ্ধা। বাড়িটার মাথার ওপর লেখা রয়েছে, "উপাসনা মন্দির।" বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কিছুক্ষণ মন্দিরে থাকব। তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও ?"

'হ্যাঁ' বললে বৃদ্ধা খুশি হতেন। কিন্তু আশপাশে গাড়ির সংখ্যা দেখে অর্জুন বুঝল, মন্দিরে ভাল ভিড় হবে। ইতিমধ্যে ঘোষণা শুনে ফেলা কোনও লোক তাকে দেখে সন্দেহ করলেও দফা রফা হয়ে গেল। সে হাসল, "আমি না হয় অপেক্ষা করি।"

"বেশ।" বৃদ্ধা নেমে গেলেন। থপথপ করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, হাতে ব্যাগ নিয়ে। অর্থাৎ ব্যাগটির ব্যাপারে তিনি বেশ সতর্ক।

অর্জুন গাড়িতে বসে ছিল চুপচাপ। তারপর কী মনে হতে গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। এইটে এঞ্জিন চালু বা বন্ধ করার সুইচ। বৃদ্ধা এইটে নীচে নামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করেছিলেন। এইটে কী ? পাশে কিছু লেখা নেই। গোটা-আটেক নানা ধরনের সুইচ সে টিপতে লাগল এঞ্জিন চালু করার সুইচটিকে বাদ রেখে। হঠাৎ রেডিও বেজে উঠল। গান হচ্ছে, 'ও আমার সোনার বাংলা'। বাঃ, চমৎকার। অর্জুনের মনে হল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কপিরাইট আইনের সময় শেষ হওয়ায় তাঁর গান নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, তাঁদের এখানে এসে শোনানো উচিত। মৃত্যুর একশো সত্তর যোগ পঞ্চাশ বছর পরেও কী সততার সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে।

গান শেষ হতেই ঘোষক বললেন, "সতর্কীকরণ ! আজ ভোরবেলায় জাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক ব্যক্তি আমাদের সুরক্ষা দফতরের জানলা ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে। লোকটির পোশাক বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতো, ধূমপান করে এবং নিজের নাম অর্জুন বলে পরিচয় দেয়। লোকটি একা কি না তা জানা নেই। তবে যেভাবে সে নিখোঁজ হয়েছে তাতে বোঝা যায়, তার সঙ্গী থাকতে বাধ্য। যে-কেউ এই লোকটির সন্ধান

পাবেন তাঁকেই কালবিলম্ব না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

অর্জুনের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল। ওরা এখন তাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছে। উপাসনা মন্দিরে যদি ওই ঘোষণা শোনা যায় তা হলে বৃদ্ধা এতক্ষণে··· ! সে রেডিওর সুইচ অফ করল। তারপর জায়গা পরিবর্তন করে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসল। স্টিয়ারিং বলতে একটা গোল চাকতি। ক্ল্যাচ নেই, গিয়ার নেই শুধু অ্যাক্সেল্যারেইটর্ আর ব্রেক। সে এঞ্জিন চালু করে অ্যাক্সেল্যারেইটর্ চাপ দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রথমে হাত কাঁপছিল। কিন্তু মোটরবাইক চালানোর অভ্যাস থাকায় গাড়ির চলাকে আয়ত্ত করতে অসুবিধে হল না। এমন মজার ড্রাইভিং যদি বিংশ শতাব্দীতে জলপাইগুড়ির মানুষ করতে পারত ! প্রথম মোড় এগিয়ে এল। দু'জন পুলিশ তার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে। দমবন্ধ করে অর্জুন মোড়টা পার হতেই 'বাহির পথ' লেখা বোর্ড দেখতে পেল। সে দ্রুত গাড়ি সেই পথে নিয়ে যেতে-যেতে গতি সামলালো। সামনে এখন প্রচুর গাড়ি। এভাবে চালিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে কোনও লাভ নেই। এ-জীবনের জন্য এখানেই থেকে যেতে হবে।

ধীরে-ধীরে সে অন্য গাড়িদের অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠে এল। ওঠার পরেই মনে হল সে জানে না কোন দিকে যেতে হবে। ডান না বাম। বামে যেতে হলে ফ্লাইওভারে উঠে ওপাশে গিয়ে গাড়ির স্রোতে মিশতে হবে। অর্জুন অনুমান করল তাকে ডান দিকেই যেতে হবে, কারণ সে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাইওয়েতে যে-গতিতে গাড়ি যাচ্ছে, আনাড়ি হাতে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল। দু'-দু'বার দুটো গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে-লাগতে বেঁচে গেছে। লেন ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে। তবু স্পিড বাড়াতে দ্বিধা করছে না অর্জুন। হঠাৎ চোখে পড়ল মাথার ওপর সাইনবোর্ড, "বিদায় অতিথি, জলপাইগুড়ির স্মৃতি সুখকর হোক।" সাইনবোর্ডটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে দেখল এপাশে সুস্বাগতম লেখা। আঃ। সে ঠিক পথেই যাচ্ছে। বলাকা তাকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পেছন থেকে বিপ-বিপ শব্দ ভেসে এল। গাড়ির আয়নায় অর্জুন দেখল একটা লাল আলো জ্বালানো গাড়ি তার পেছন-পেছন আসছে ওই শব্দ করতে-করতে। এটা নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। পুলিশ তার খবর পেল কী করে ? বৃদ্ধা কি তাঁর গাড়ি হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন ? অর্জুন আরও গতি বাড়াল। তার গাড়িই একমাত্র হর্ন দিচ্ছে। ফলে অন্য গাড়ি সামনে থেকে সরে গিয়ে পথ করে দিতে লাগল। এঁকেবেঁকে অর্জুনের গাড়ি ছুটতে লাগল সামনে। পেছনের পুলিশের

গাড়িটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে গতি বাড়াল। খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন বুঝতে পারল পুলিশের গাড়িটা অনেক শক্তিশালী। প্রায় তার গায়ের কাছে চলে এসে পুলিশ অফিসার হাত-মাইকে আদেশ করলেন, "গাড়ি থামাও নইলে গুলি করব।"

অর্জুন কান দিল না। এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমি। হঠাৎ ডান দিকে জঙ্গল দেখতে পেল। পুলিশের গাড়ি এবার তার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে। রিভলভারটাকে প্রায় নাকের ডগায় দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল অর্জুন। তার হাত কেঁপে উঠল। ব্রেকে পা দেওয়ার বদলে চাপ বাড়ল অ্যাক্সেল্যারেইটরে। দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। অর্জুনের গাড়ির ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি ছিটকে গেল রাস্তার একপাশে। অর্জুনের গাড়ি পাক খেতে-খেতে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে ছুটল আরও জোরে। পেছনে কাত হয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির দিকে তার নজর দেওয়ার সময় নেই।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বিপ্-বিপ্ আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা। অর্জুন বুঝল আরও পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে। এরা সম্ভবত হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওরা গুলি করবেই। অর্জুন পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল। এই জঙ্গলটাই তো? তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। সেগুলো কোথায়? বুলডগের মতো গাড়িগুলো ছুটে আসছে পেছনে। অর্জুন দেখতে পেল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। সে চকিতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। ব্রেক কষেও শেষরক্ষা করতে পারল না, গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রাস্তার পাশের রেলিঙে। মেরে স্থির হয়ে গেল।

দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে অর্জুন জঙ্গলের দিকে দৌড়তে লাগল। পুলিশের গাড়িগুলো ব্রেক কষে থামতে-থামতে সে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। এবং তখনই তার কানে খুব নিচু পরদায় ঘেউ-ঘেউ ডাক ভেসে এল। অর্জুন চিৎকার করে উঠল, "তাতান।"

কিন্তু চিৎকারটা এবার পেছন থেকে। অর্জুন দেখল একগাদা পুলিশ চেনবাঁধা কুকুর হাতে নিয়ে ছুটে আসছে। কুকুরগুলো হিংস্র, ডাকছে তারাই। অর্জুন ছুটল। একটা সময় কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল, কিন্তু খুব কাছ থেকে নিচু গলার ডাক ভেসে এল। অর্জুনের মনে হল তাতানকে নিয়ে সেই অন্য গুহবাসী তার সামনে এগিয়ে চলেছে। এর মানে ওরা সারাক্ষণ তার সঙ্গে ছিল।

মাথার ওপর এখন বিমানের আওয়াজ। অদ্ভুত চেহারার বিমানগুলো এখন জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎই তাদের একটা অর্জুনকে দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে জোরালো আগুনের একটা রশ্মি নেমে এল ওপর থেকে। অর্জুন দৌড়ে সময়মতো সরে গিয়ে দেখল সেই জায়গার

www.murchona.com

গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

স্তিমিত হয়ে আসা কুকুরের ডাক অনুসরণ করে কিছুটা যেতেই সে তিনটে সিড়িঙ্গে গাছ দেখতে পেল। অর্জুন এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, খেয়াল করেনি একজন পুলিশ অফিসার তার দিকে এগিয়ে আসছে। যখন দেখতে পেল তখন মেশিনটার উদ্দেশ্যে না দৌড়ে কোনও উপায় নেই।

মাথার পাশ দিয়ে দু-দু'বার গুলি ছুটে গেল। মেশিনটার কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সে পেছনে তাকিয়ে হিংস্র পুলিশটিকে দেখতে পেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করেছে। হঠাৎই লোকটা হতভম্ব হয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়াল। অদৃশ্য কিছু তাকে ধাক্কা মেরেছে বলে মনে হল। অর্জুন আর অপেক্ষা না করে মেশিনে উঠে বসে এঞ্জিন চালু করার সুইচে হাত দিয়ে নব ঘোরাতে লাগল। একশো সত্তর বছর পিছিয়ে যেতে হবে তাকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। অর্জুন চোখ মেলে দেখল চারপাশ কেমন অন্ধকার-অন্ধকার। সে কোথায়, প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। শরীর একটু স্থির হতে সে মেশিন থেকে নামার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বুঝতে পারল এটা ডক্টর গুপ্তর গবেষণাগার। কোনও পুলিশ অফিসার সামনে নেই বন্দুক উঁচিয়ে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে দরজার কাছে এগোল। না। বিদ্যুতের ছোঁয়া নেই ওখানে। দরজা ঠেলল সে। ধীরে-ধীরে খুলে গেল সেটা। সেই সিঁড়ি এখন অন্ধকারে ঢাকা। নীচের ঘরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। কিছু লোক কথাবার্তা বলছে। অর্জুন হ্যাজাকের আলো লক্ষ করে নীচে নেমে আসতেই একজন চিৎকার করে উঠল, "কে ? কে ওখানে ?" অর্জুন দেখল, খাঁকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।

ভদ্রলোক একা নন, সঙ্গে আরও তিনজন সেপাই আছেন। চারজনেই উঠে এসেছেন অর্জুনের সামনে। প্রত্যেকের চোখমুখে বিস্ময়।

অর্জুন বলল, "আমি অর্জুন। ডক্টর গুপ্ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।"

অফিসারটির চোখ ছোট হল, "কখন নিয়ে এসেছিলেন ?"

"সন্ধেবেলায়। ঠিক সন্ধে হয়নি তখনও।"

"আপনি ওপরে ছিলেন সেই থেকে ?"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাননি ? আমরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি এই বাড়ি। ওপরের ঘরে কেউ ছিল না। এই, একে অ্যারেস্ট করো।"

অফিসার হুকুম করলেন।

এর কিছুক্ষণ বাদে, গভীর রাত্রে অর্জুন শিলিগুড়ির থানায় বসে ছিল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছেন কাজে। তিনি না ফেরা পর্যন্ত কেউ তার কথা শুনবে না।

অর্জুন হতাশ হয়ে পড়ছিল। একশো সত্তর বছর আগে গিয়ে তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছিল। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেও সেই একই অবস্থা ?

দারোগাবাবু এলেন রাত দুটোর সময়। রিপোর্ট নিশ্চয়ই আগেই পেয়েছিলেন, ঘরে ঢুকে বললেন, "কে হে তুমি ? ওই বাংলোয় কোন মতলবে ঢুকেছিলে ?"

অর্জুন বলল, "আপনারা খুব ভুল করছেন। আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি শহরে থাকি। ডক্টর গুপ্তই আমাকে ওখানে নিয়ে যান।"

হঠাৎ দারোগাবাবুর মুখচোখ বদলে গেল, "আরে তাই তো ! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? ডক্টর গুপ্তকে যখন হসপিটালাইজড করা হয় তখনও তিনি আপনার নাম বলছিলেন !"

"উনি কেমন আছেন ?"

"খুব খারাপ। বাঁচার কোনও চান্স নেই। হেড ইনজুরি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন।"

"বেঁচে যাবেন।" অর্জুন বলল।

"মানে ?"

"কিছু না। আর কী হয়েছে ?"

"যারা এসেছিল ডাকাতি করতে তারা নীচের তলাই তছনছ করেছে, ওপরের ঘরে ঢুকতে পারেনি। কিন্তু একটা খবর আমরা ডক্টর গুপ্তকে দিতে পারিনি। ওঁর যা কন্ডিশন !"

"কী খবর ?"

"কারেন্ট অফ করে ওপরের ঘরে ঢুকে আমরা কোনও কুকুরের দেখা পাইনি। আপনিও ছিলেন না। ডাক্তার গুপ্ত কেবলই তাতান-তাতান করছিলেন !" দারোগার আবার মনে পড়ল, "আপনি কোথায় ছিলেন ?"

"ওপরের ঘরে অনেকগুলো যন্ত্র ছিল, তার একটাতে ঢুকে ঘুর্মিয়ে পড়েছিলাম। অঘোরে ঘুমিয়েছি।" অর্জুন হাসল।

"আচ্ছা। হ্যাঁ, যন্ত্রগুলো দেখেছি কিন্তু কী থেকে কী হয়ে যাবে ভেবে আর খুলে দেখিনি। তা হলে কুকুরটাও তার একটাতে থাকতে পারে !" দারোগা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"না, নেই। তাতান এখানে নেই।" মাথা নাড়ল অর্জুন।

দারোগাবাবুই রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘুম ভাঙার পর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাজ্জব অর্জুন। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ির তারিখ একশো সত্তর বছর এগিয়ে। সে কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সময়টাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই ঘড়ি আবার চালু হল। প্রায় ঘণ্টা-চব্বিশ সে এই সময়ে ছিল না। কিন্তু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে রওনা হয়েছে এক সকালে, পৌঁছল রাতের বেলায়। যাওয়ার সময় তো এমন কাণ্ড হয়নি। পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পুবে এলে সময় বেড়ে যায়, সেইরকম কিছু ?

সকালবেলায় দারোগাবাবুর সৌজন্যে লুচি-তরকারি আর চা খেতে যে কী আরাম লাগল তা কাউকে বোঝাতে পারবে না অর্জুন। আহা, একশো সত্তর বছর পরের মানুষগুলো এসবের স্বাদ জানবে না।

ঠিক ন'টা নাগাদ শিলিগুড়ির হাসপাতালে গিয়ে শুনল কলকাতা থেকে বড়-বড় চিকিৎসকরা এসেছেন। ডক্টর গুপ্তের মাথায় অপারেশন হবে। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এক মুহূর্তের জন্য ডক্টরের দেখা পেল। অজ্ঞান হয়ে আছেন। অর্জুন বিড়বিড় করল। পাশে দাঁড়ানো দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কি বলছেন ?"

অর্জুন বলল, "আর কয়েক বছর বাদে উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।"

"তার মানে ? উনি ভাল হয়ে যাবেন ?" দারোগা অবাক।

"অবশ্যই। মাথার এই আঘাতটা ওঁকে সাহায্য করবে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠল। জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলায় রূপমায়া সিনেমার সামনে বাস থেকে নেমে কিন্তু ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী ঘিঞ্জি রাস্তা, রিকশা, গাড়ি মানুষের ভিড়ে হাঁটা মুশকিল। একশো সত্তর বছরের পরে এই জায়গাটাকে চেনা যাবে না। এখনকার ভাল আর তখনকার ভালগুলোকে যদি এক করা যেত !

হঠাৎ তার তাতানের কথা মনে পড়ে গেল। তাতানকে সেই রাত্রেই তার ভিন্নগ্রহের বন্ধু নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সেই গ্রহে বয়স বাড়ে না। তাই তাতান একশো সত্তর বছর পরেও একই রকম আছে। ইচ্ছেমতন মাঝে-মাঝে বন্ধুর সঙ্গে পৃথিবীতে ঘুরে যায়। ডক্টর গুপ্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে খুশি হবেন।

অর্জুন নিজের গালে হাত বোলাল। যাঃ, এর মধ্যেই খরখরে দাড়ি বেরিয়ে গেছে। ভাল ভাবে শেভ করে স্নান করা দরকার। সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

www.murchona.com

Arjun Beriye Elo by Somoresh Majumdar

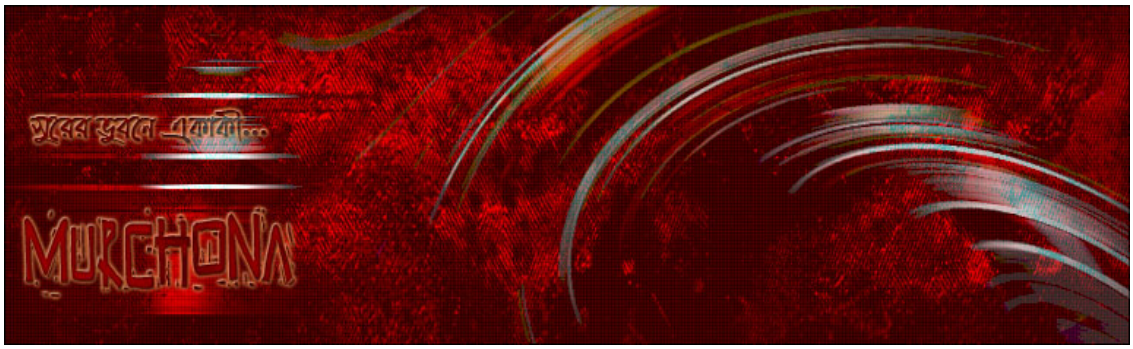

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com